বাংলা আধুনিক সরস কবিতা

কালজয়ী সৃষ্টি

বাংলা আধুনিক সরস কবিতা

সঙ্কলন ও সম্পাদনা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

উৎসর্গ

শ্রী গোবিন্দ দাশ

প্রিয় বন্ধু - সতীর্থ করকমলে

সূচীপত্র

আধুনিক সরস কবিতা : ভূমিকা

সব কবিতাই সরস কবিতা, সরস কবিতা বলতে তবু বুঝতে হয় লঘু আমোদের হাসি-তামাসার রঙ্গরসের সখের সুখের ফুরফুরে সব লেখা, বিরলে আত্মস্বাদ করার নয়, পাঁচে মিলে উপভোগ করার কবিতা। আমোদ জমে ওঠে কখনও পরপীড়নে, হাসি হয়ে ওঠে বিহাস প্রহাস উপহাস অতিহাস, এমন কি সুপ্রতিষ্ঠের উৎপ্রাসন : ইংরেজিতে যাকে বলে lampoon, বা নিগ্রহ — বেকুব বেল্লিক বেপছন্দ লোকের উপরে নিতান্ত পুলিশি, কিংবা নাও তা হতে পারে, অনেক-পঙ্ক্তি সরস কটুবাদ করার পরেও কবি বলতে পারেন : 'সে কেবল ব্যঙ্গ মাত্র, নহে মনোগত', অর্থাৎ ব্যঙ্গও বিন্ধন না হয়ে হতে পারে কৌতুক মাত্র। উপলক্ষ্য বাদ দিয়ে সে থেকে যেতে পারে নেহাৎতই আলগা রসিকতার, আদিরসের, যমকঝঙ্কৃত কথারও রঙদারি হয়ে। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা', তখনও বঙ্গ ভঙ্গ হবার ঢের দেরি। সত্যি দু দেশে দু ভাগ হয়ে যাবার পর মুখে কালি ধরে সে রঙই পরীবাদ বা *humour noire* হয়ে উঠল কিনা একটা ধন্দ জাগে।

দেশ বা পরিস্থিতি একটা বড়ো আলম্বন সরস কবিতাতে। আত্মগত নয়, সে সামাজিক কবিতা। তবু ভাঙা বাংলার তাপেই হাসি কালো পরিহাস বা আত্মপরিহাস হয়ে উঠেছে বলা যাবে না কেননা দেশদুর্দৈবের চেয়ে অশোভন নিত্যাচারেই তার স্ফূর্তি। 'তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু শিখি নি শিং বাঁকানো / কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস' আর 'এক হাতে ওর গাজর আছে আরেক হাতে বোমা / গাধার বাচ্চা চমকে বলে ও মা!' প্রাত্যহিকের অতিগ এই দুই প্রসিদ্ধ রাজনীতি-পরীবাদের দেশচেতনা শ্রেণীচেতনা ভাঙা-দেশের সূত্রে নয় এবং বিষাদের বেশিও এতে নেই। এর পাশে যখন দেখি 'এক সাথে বেড়াল ও বেড়ালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে' ভূয়োদর্শী যুবার আশ্চর্য শক্তি, কিংবা 'শিশুরা দাঁড়িয়ে আছে — কেরোসিনে ভেজা ধারাপাত', ডেয়ারির সয়াবীনে-ধুতরোবীজে মেশানো আগ-মার্কা দুধ খেয়ে তাদের দুধের দাঁত ঝরে গেল — মনে হয় এই কালিম পরিহাসের প্রৌঢ়ী (ব্রেতঁ বলেছেন তার ভারী হাওয়ার ভেতরে সেন্টিমেন্টালের স্থান নেই) এভাবে দেশভাগের আগে তত দেখা যায় নি এখানের কবিতায়, এবং দেশভাঙার অনন্য কারণে না হোক, কবির আত্মধাতু আর দেশের সময়বিপাকে মিলে — সামাজিক স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে নেতি-

সংশয়-অবিশ্বাসের আধুনিকতর একটা সূত্রেই গড়ে উঠেছে এই গুরুভার রসিকতা। কেবল মজ্জাগত অসূয়া-নিষ্ঠুর হাসি এ নয় যেমন এ বইয়ে উদ্‌ধৃত করেছি মধুসূদন থেকে : 'নলিনীরে সৃজেন বিধাতা / জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার / হাসিয়া কন্টকময় করি নিজ বলে'; অশ্রু গূঢ় হয়ে থাকা হাসি নয় (যথা, 'নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে / লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল' : 'হাসি', প্রমথ চৌধুরী); হাস্য-করুণে মেশানো সিরিও-কমিকও নয়; বরং প্রথায়ত রস-সরসতার সমূহ প্রতিবাদ, কালো কমেডি যেমন মূলত বি-কমেডি বা anti-comedy, তিক্ত বিধ্বংসী প্রহাস ছাড়া হাসি নেই তার। মুহূর্তলক্ষণ হয়তো আজ এমনই, হাসি যখন ক্রমাগত শ্লেষাক্ত হয়ে উঠছে জীবনের অপার নিঃসহায়তার মুখে মুখে, শ্লেষ হয়ে উঠেছে গ্লানি-বিরসের রস, সর্বৈব সামাজিক লেখাতেও অদম্য যেখানে কবির আত্মপীড়া, যা সত্ত্বলক্ষণ। সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে বা সুসমাজে গ্রহণীয় হতে আজ হয়তো কবি লেখেন মিডিয়াবিলাসী কবিতা, হয়তো অস্বচ্ছ অ্যাবসার্ড। সেও সরস কবিতা। বিরূপ (grotesque) মুখোশের হো হো হাসি খুলে দস্তুর সত্যও তিনি দেখিয়ে দেন পাশাপাশি (দ্র 'দুজন', সুনীল বসু) , মুখোশের তঞ্চকতাকেই প্রকট করে তুলতে, মুখোশে মেক-আপেই যদিও চিরকেলে কমিক চারিত্র।

লঘু আমোদের হাসি-তামাসার রঙ্গরসের ঠাঁই আছে কি আজ এই বিযূথ সমাজে, বিশ্বনিয়মের স্থানে পদে পদে যখন শুধু বিশ্ববেনিয়ম, পদে পদে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সংস্কার, প্রত্যাশা? সে সানন্দ সমাজ আজ কোথায় যেখানে তরজা-কবি বেঁধে, খেউড়-খেমটার লহর তুলে, ছড়া-হেঁয়ালির কাটনা কেটে, লালিকা-ম্যাকারনিক্ লিখে, নিদেন 'হসন্তিকা', 'প্রহাসিনী', 'আমোদ' বা 'খাপছাড়া' - 'আবোলতাবোলে'র দুশো মজা বাজিয়ে তুলে সর্বজনের সুখবিধান করতে নিযুক্ত হবে ফের কবিতা? বঙ্কিমের অনুকণ্ঠে হয়তো মুখে উঠে আসে, সে সানন্দ সমাজে আজ আর কাজ নেই কেননা তার আর অবকাশ নেই আজ কোনোখানে। দেশের অবস্থা আবার ফিরে অবনতির পথে না গেলে দেখা মিলবে না তার আর। যত বিপরীতই লাগুক 'আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্বণ" চাই না', যদিও পৌষপার্বণের গূঢ় ডোর আজও ছেঁড়ে নি, যদিও রুচি লক্ষ্য স্থিতি বদলে কবে আরেকরকম হয়ে গেছে আমাদেরও বাস্তু, অগোচরে। মতবদ্ধ কবি আজও সামাজিক কবিতা লেখেন, কিন্তু সে দায়-মানা হিতবাদী লেখা, আমোদ কবিতা নয়। অস্তিত্বপীড়িত কবি মর্মবেদনা রূপান্তর করে হয়তো লেখেন অ্যাবসার্ড, স্বতোৎসার আমোদ না হোক, হাস্যসরসেরই সে অপ্রাকৃত, তার কঠিন বক্রিম হাসি যেন যূথচ্ছিন্নের আত্মস্থ হবার একটা প্রক্রিয়া, চারিপাশের আগ্রাসী নেতির মুখে যুঝবার কারুকবচ। সর্বজনের না হোক, সমানধর্মার শস্ত্রের মতো দুঃখে-হাসিতে জোড় দেয়া সঙ্কর একটা সরসতা যেন সে, গুরু কবিতারও কোনোখানে আজ হয়তো জমে উঠতে দেখা যায় — দুনিয়ার জাগতিক হালচালে কবি যেমন সরহসে লেখেন ঘটিরাম ডিপুটির

স্বাধীনতাপরের বিচক্ষণ দেশবোধ বা নব মুচিরামের অবসরজীবনের ইষ্টনাম : 'হরি বলো মন, তবে পেন্‌সনটা গোনো', তেমনি সে জাগতিকের উত্তাপ দংশনে 'ক্ষুব্ধ তানসেনী তান'ও উচ্চকিত করে তুলতে পারেন, বা তুরীয়াপন্ন নিজের প্রসঙ্গ : 'সে রঙ্গরসিক বলে আমি ভ্রান্তিবিলাসে সম্রাট' — সূত্রধরের রঙ্গরসে স্বাভাবিক ভূমিকা ছেড়ে ভ্রান্তিবিলাসের অনুপায় কৌতুকাভিনয়ে যেখানে কস্‌মিক পরিহাসের ছায়া পড়েছে। পূর্বসূত্র চাপা নেই হয়তো এই তিক্ত সমাজরহস্যে, আত্মপীড়াতেও। কিন্তু তীব্র আত্মযাতনা অনাবৃত করে যখন দেখান 'মত্ত কুকুরের মতো আমাদের দাঁতের রগড়', দাঁত আর রগড়ের রসায়নে যে *farce tragique* বা অতিগ-তর পরাবাস্তবের যৌগিক গড়ে ওঠে, তার খেই খুঁজে পাওয়া যায় না যেন হঠাতে। পুরোনো আলঙ্কারিক বলেছেন, হাস্যরসতা নীচপাত্রগত এবং সত্ত্বগুণের অভাবজনিত। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের বিদূষক কুরূপ হওয়া সত্ত্বেও শীলধর্মবিদ্যান্বিত বিপ্র এবং সুরসিক; মাধব্য বা মৈত্রেয় তার নাম, রাজার নর্মসুহৃদ সে এবং অন্তঃপুরেও তার নিষেধ নেই। আমাদের আগে-দিনের সাহিত্যতত্ত্ববিৎ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় করুণ-কমিকের সংজ্ঞা লিখতে চিন্তাযুক্ত প্রথমের বিপরীতে কমিক চিন্তাশূন্যতা ও সফরীরঙ্গের লক্ষণ স্থির করে দিয়েছিলেন, কমলাকান্তের অনেক সংখ্যা দপ্তর ততদিনে বেরিয়ে গেছে।

কমলাকান্তের কথার মধ্যে এক স্থানে পাওয়া যায় 'দুঃখবিনোদন' বলে একটা যৌগিক পদ। 'সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য' কমলাকান্ত লিখছেন, 'সংসারসমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসারবাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ, সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ' — বিচ্ছিন্নের অস্তিত্বভয়ের (angst) উন্মেষের আভাস লেগেছে যেন স্বরায়ণে, তাঁর সমস্ত নির্লক্ষ্য মূলহীনতাই সংসারের সূত্রে অর্থাৎ সমাজপ্রসূত, যে সমাজের সঙ্গে বন্ধন হল না বলে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কালে বলছেন, 'এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না, কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে।' অশ্রুপর সুখবঞ্চিতের মতো হাস্যজনক আর কে? হার-মানা আত্মকরুণার ক্লেশস্মিতিই যেন কালক্রমে ক্রুদ্ধ তিক্ত প্রহাসিকা হয়ে উঠে দিদি আর গোগোর মতো ব্যাপৃত হল মোটামুটি আপতুষি একটা সময় কাটানোর কৌশল উদ্ভাবনে (স্ম° বেকেটের *En attendant Godot*), কিংবা কবির চোখে পড়ল : 'যেন শুধু সরমাকে নগ্ন করে সারমেয়দের / চাঁদের আলোর নীচে সবচেয়ে বিখ্যাত আমোদ।' এ কি শুধু হেলাফেলা লঘুভার সময় কাটানোর রঙ্গ? 'শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা...'? মর্মভারহারা অসাত্ত্বিক? আকস্মিকও নয় নিশ্চয়। কেবল প্রশ্ন, একে কি সরস কবিতা, আমোদ কবিতা বলতে পারব অকুণ্ঠিত হয়ে?

২

ভালো হত বিদূষকের প্রহাসকবিতা (বা parabasis) যদি মিলত অথবা জীর্ণ দপ্তরের কোনোখানে কমলাকান্তের পদ্যবন্ধ; একজন গুরু নাটকে আত্মবিলয়কারী, নব্যজনেও স্থিতি লাভ করতে পারেন নি সদ্যাস্তৃত উপনিবেশকৃষ্টির বলয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক, কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না', দেবদত্তকে রাজপৌরোহিত্য দিয়ে হয়তো তিনি প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন, তবু বলতে হয় সম্মানের আশা থাকলে বিদ্ধনের হাসি ফোটে না। 'রাজা ও রানী' নাটকের গোড়াতেই রাজাকে রানীর রাজত্বে পাঠিয়ে তারপরে মন্ত্রীকে বলছেন দেবদত্ত (১.১) : 'না হাসিয়া করিব কী?... দিবসরজনী / বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে/রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি / জমাট অশ্রুর মতো তুষারকঠিন।' এ সত্য দেহী হয় নি কেননা মূলে সে বিদূষকই বটে, আবার রূপ ঋদ্ধি নিয়ে বিদূষকের সীমানার বাইরে। বঙ্কিমের উজ্জ্বল শুভ্র হাস্যজ্যোতিও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন প্রহসনের সীমানার বাইরে ('তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে'), যে গভীরতা থেকে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত হয় তারই সগোত্র, যদিও হাস্যসরসের উচ্চশ্রেণী বলতে স্বয়ং বুঝেছেন ভাঁড়ামি-আদিরস শোধিত সুরুচিশালীন উপরঞ্জিকা বিশেষ, কেবলই যা কৌতুকরঙ্গময় তেমন প্রহসনের বাইরে যেতে দেখি না তাঁকে পারতপক্ষে। ক্রুদ্ধ প্রহসন, যা সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌মের সংলগ্ন? 'আপনি কন্টক আমি, আপনি জর্জর' — প্রথম যৌবনের এই 'জর্জরে'র রসান্তর ঘটতে পারে হয়তো পরে, কিন্তু একই কালের 'দামু বোস আর চামু বোসে কাগজ বেনিয়েছে, / বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে! / (আমার দামু আমার চামু)' যখন পাড়ি, কিংবা তারপর 'ধর্মপ্রচারে'র লাঠি ও রক্তপাতের প্রহাসিকা, মনে হয় উনিশ শতকের অশোধিত ক্রোধহাস্যের জের কাটে নি যেন।

প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ বলেছেন ইংরেজ সংশ্রবের ফলে বাংলার রঙ্গরচনা ব্যঙ্গরচনার স্ফূর্তি হয়েছিল নগরে ও তার উপকণ্ঠে, প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগে ভক্তি আর আদিরসে ভাগাভাগি লেখায় একজন ভাঁ, দত্ত বা একজন হীরা মালিনীর জবানিতে মাত্র তার শীর্ণ অবস্থান। শাঠ্য-কাপট্যের চাইতে কোমল রসলহরীর মাদক বেশি। গুরু লঘু দুই কবিতাতেই ভারতচন্দ্র অবচলিত গুণাকর রূপে কোম্পানির রাজ্যকাল উপচিত হয়ে আছেন। বঙ্কিম লিখেছেন, 'ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরা মালিনী গড়িবার ক্ষমতা' ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। 'ইংরাজী বিদ্যোজ্জ্বলবুদ্ধি নব্যবাবুদের' প্রতিবাদ করে রঙ্গলাল লিখেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পঙ্‌ক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে...'। ভারতের স্থানে মধুসূদনকে রাজাভিষেক দেওয়ার কালেও হেমচন্দ্রকে স্বীকার করতে দেখি, অমৃতনিষ্যন্দী শব্দবিন্যাসের দক্ষতা ভারত 'যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই।' মধুসূদন নিজেও মেনেছেন, তবে শব্দলহরী নয়, অন্নদার ঝাঁপি, অন্নদামঙ্গল কাব্য : 'যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে', আর বিদ্যার, সুন্দরের, নাগরীকামিনীদের, মালিনীর রসের পসরা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে গেছে সর্বসাধারণের সমাদরধন্য গীতে নাটে। বলা হয় লোপ পাবার কালে বিদ্যাসুন্দর নব প্রাণ সঞ্চার করেছিল যাত্রায়, ভৈরব হালদারের পালায় গোপাল দাস মালিনী সেজে আসর মাত করার পর হাজারটা বিদ্যাসুন্দর পালা আর বিদ্যাসুন্দরের দল গজিয়ে উঠেছিল

শহরে মফস্বলে। হুতোম লিখেছেন দুর্গোৎসবে শহরের 'পুজোবাড়ির বাবুরাই খোদ... খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেছেন', এবং 'আজকাল আমরা বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়িতে, বেদেনীর নাচ ও "মদন আগুনে"র তানে ('মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী'—গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার গান) পরিতুষ্ট হচ্ছি। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'যাত্রা সমালোচনা'য় উল্লেখ করেছেন, 'এখনকার প্রচলিত যাত্রা "বিদ্যাসুন্দর"। প্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন... এবং বাঙ্গালির রসজ্ঞতার' বিচার হতে পারে এরই দ্বারা। গত শতকের শেষে সে বিচার দেখি রবীন্দ্রনাথেরই লেখায়, অন্নদামঙ্গলকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র মান দেবার পরেও লিখছেন : ' এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন ? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস। বৈষ্ণব কবি যে জিনিসটাকে ভাবের ছায়াপথে সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন ইনি সেটাকে সমাজের পিঠের উপরে দাগার মতো ছাপিয়া দিয়াছেন; যে দেখিতেছে সেই কৌতুক অনুভব করিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসুন্দরের বিচার করেছেন সমাজপ্রেক্ষিতে, এবং গ্রাম্যসাহিত্য রূপে। কাছাকাছি সময়ের 'ভারতী' পত্রিকার দুটি প্রবন্ধে (গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী ও শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত) দেখতে পাই পুরাতন গুরু কাব্যের 'রসকবি' বলে তাঁর পরিচয়। শীতলচন্দ্র লিখেছেন ভারতচন্দ্রে 'রসিকতা উছলিয়া পড়িতেছে। সমস্ত বিদ্যাসুন্দরই যেন হাস্যরসের ভাণ্ডার।' সে হাস্য বা রঙ্গরসে প্রায়শই শালীনতা নেই, কিন্তু প্রাচীন রসিকতার ধরনটাই এইরকম। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন, 'সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না।' মালিনীর রঙ্গরসের অশ্লীলতাও ধর্তব্য হয় না অতএব সে বিচারে। এ যুগেও হাস্যরসের আলোচনা সূত্রে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'রসপিপাসু হাস্যরস-সন্ধানী বঙ্গবাসীরা অনেক দিন পর্যন্ত ভারতচন্দ্রের কবিতার রস-সম্পৃক্ত দুই-চারি পঙ্‌ক্তি আওড়াইয়াই সাহিত্যের রসাস্বাদের সাধ মিটাইতেছিলেন।'

কোন্ অভিনবের সূত্রপাত হল তা হলে নতুন কলোনিতে? মেকলে-কালীন বহিঃশাসকেরা বিজিতকে নিম্নজাতি জ্ঞান না করুন, তার ধর্মসংস্কৃতিগত দীনতাহীনতাকে ধৌত-শোধিত করে তুলতে যত্ন করেছিলেন এবং কেবল বিত্তে নয়, রুচি ও শিক্ষাতেও উচ্চ নীচ একটা শ্রেণীভেদ খাড়া করে তুলতে পেরেছিলেন। বীটন সমাজের সাহিত্যসভায় বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করেন 'ফেনী হিল নামক অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থের (জন ক্লিল্যাণ্ড : *Fanny Hill : Memoirs of a Woman of Pleasure*) সঙ্গে। ইংরেজের 'ঢাকবাদ্যপ্রেমিক' বলে যে উপহাস বাইসেরা বাদ্যের সঙ্গৎ নিনাদিত কবির লড়াই দেখে, তার চারজোড়া ঢোল ও চারখানা কাঁসি সহযোগে আকাশবিদারী যমকদূষণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার তার চাইতে তীব্র। 'ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে... দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা'য় নিবেদিত এই গান। কিন্তু যে 'কবিগান এক সময়ে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী

ছিল' (দ্র 'কবিগান' : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ) একদিকে যেমন ইতরসাধারণের চাপে সে খেউড় -লহর আর সানুপ্রাস চাপান-কাটানের উত্তেজনায় পর্যবসিত হল তেমনি মান্য সমাজও সর্বত পরিহার করলেন তাকে (স্ম° '...with the spread of Westerm education and consequent revolution in taste, these songs had been banished totally from 'respectable' society and descended to the lower classes...'. সুশীলকুমার দে : *Bengali literature in the Nineteenth Century*)। 'বিখ্যাত ও সর্বপ্রিয়' কবিওয়ালা নিত্যানন্দ বৈরাগীর কথাতে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, বিরহ ও সখীসংবাদ গেয়ে যিনি আসর জমাট করতেন, ছোটোলোকেরা আসরে দাঁড়িয়ে 'খাড় গা' বলে চিৎকার শুরু করাতে তিনি 'তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।' গরিষ্ঠ গ্রাহককে না মেনে উপায় কী? ঈশ্বর গুপ্তও প্রথামবধি কবির লড়াইয়ে শিক্ষিত, যাত্রা পাঁচালি হাফ আখড়াইয়ের বাতাসে পরিপূরিত (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'সিমলের দলে হাফ আখড়াই গান বেঁধে দিতেন কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত'), 'শ্রোতার ক্ষণিক আমোদ' তিনিও উপেক্ষা করতে পারেন না, সে কারণে খেউড়-টপ্পার ('ব্যঙ্গোক্তিজনক হাস্যরসাত্মক গানের নাম টপ্পা', অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ) সরস অশীলতা অবাধে ঢুকে পড়ে তাঁর লেখায় এবং 'একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিয়া দিলে আর বন্ধ হয় না, আর কোন দিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে'; রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সেই ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে,... ক্ষণিক, ত্বরিত, সহজ উত্তেজনার উদ্রেক করে', কিন্তু এই শব্দঘটার প্রভাবে কবি-পাঁচালি লোকের এত প্রিয়, দাশু রায়ের এত সমাদর, এ বাবদে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদেরই অন্যূন একজন। কিন্তু তারই সঙ্গে সদ্য সমাজের তিনি প্রমুখ, তিনি সংবাদপত্ররচয়িতাও বটেন। বঙ্কিম তাঁর বহুল সামাজিক অভিজ্ঞতার কথাতে লিখেছেন 'কলিকাতা শহরের'এবং 'গ্রামদেশের' যোগে তিনি সমগ্র 'বাঙ্গালার সমাজের কবি'; উপরন্তু তাঁর সময়কালের তথাকথিত 'বিশুদ্ধির বড়াই' তাঁর নেই; বঙ্কিম লিখেছেন, যখন 'ইংরেজির ভরা গাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে', সে সময় তাঁর 'খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড়ো মিঠে লাগে।'

বাংলা-ইংরেজির সংসর্গে পুরাণের স্থানে গোচর হয়ে উঠেছে চতুষ্পার্শ্ব সমাজ, যা প্রত্যক্ষ, আর সেই সূত্রেই 'ঈশ্বর গুপ্ত রিয়ালিস্ট এবং ঈশ্বর গুপ্ত আইডিয়ালিস্ট' — আপনার কারণে দেশবৎসল, বেসমাজীর সম্বন্ধে অসহিষ্ণু বা দণ্ডহস্ত, এবং যদিও 'ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়', তাঁর ধারা বয়ে গেছে দীনবন্ধু হেমচন্দ্র থেকে ইন্দ্রনাথ অমৃতলাল বসু, হয়তো তারও পর। পুরাণের মতো ভক্তিদ্রাবী নয় সমাজ, বিশেষ সচেতন লোকের সমাজ, বরং অনেকাংশেই রন্ধ্রিল, চ্যুতিদীর্ণ; আঁটো শাসনের, সংস্কার প্রকল্পের ভেতরেও কাপট্য দুরাচার অব্যবস্থা পদে পদে, কেবল খল্বাট উদরপরায়ণের যোগ্য রঙ্গরসিকতা করা যায় না তাকে নিয়ে। তবু 'চাঁড়ালের হাত দিয়া

পোড়াও পুস্তকে!' বলে ব্যবধান কবিতায় যে রোষ করা চলে অসংজ্ঞাত ব্যাক্তি সম্বন্ধে, 'কলির রাজধানী মহাপাপনগর কলকাতা'র জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার স্বরূপ খুলে দিতে গেলে কিংবা ভণ্ডামিতে চার পোয়া পূর্ণ হলে পরে 'শিক্ষা দিলে কিলের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া' লোকসমক্ষে তুলে ধরতে গেলে অবাধ সহজে তা করা যায় না সমাজে। প্রহসনের লেখা ঠিক হয়েছে কি না বলে মধুসূদনের পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসায় কেশব গাঙ্গুলি লিখছেন, 'I could only give him an evasive reply saying, as one farce exposes the faults and failings of "young Bengal", and the other those of old Hindus, and as the Rajahs were popular with both the classes, they did not wish to offend either class by having them acted in their theatre'. অর্ধশত বছর পরেও 'আনন্দ-বিদায়' মঞ্চস্থ করা যায় নি, তরুণ কবিলেখকরা প্রথম অভিনয় রজনীতেই জুতো লাঠি এবং ইঁট সঙ্গে করে এনেছিলেন।

এলিয়টকে নিয়েও *Sw[illegible]ad* লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও অর্বাচীন কবিতা নিয়ে বিরাগ ছাড়াও হাস্যপরিহাস করেছেন। তবু পরিহাস বা প্রহসনকে শাসিত করারও একটা ক্ষমতাবান সামাজিক প্রবণতা আছে, দলগত প্রতিক্রিয়া ছাড়াও সরকারি নিয়ন্ত্রণও বসতে পারে তার উপরে, কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে ব্যঙ্গ-কবিতার কারণে, কার্টুনের নির্বাক কটাক্ষ নিয়েও এমন কি সাংসদ তাঁর সতীর্থকে আদালতের হুমকি দিতে পারেন আজও, কাগজে পড়ি। আবার খ্যাতি বা খ্যাতিবিস্তারের উপলক্ষ্য বলেও গণ্য হতে পারে ব্যঙ্গ। 'ছুচ্ছুন্দরী বধ' থেকে প্রায় সদ্য কাল অবধি অমিত্রাক্ষরের গুরুত্ব অব্যাহত রেখেছে তার অবিরল রঙ্গানুকৃতি। রবীন্দ্রনাথের বিবিধ কবিতার এত প্যারডি লেখা হয়েছে যে তা নিয়ে স্বতন্ত্র সংকলনও বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয় সাফল্যেরই সাক্ষ্য। প্রসঙ্গত, প্রথম দিকের একখানি ব্যঙ্গ 'মিঠেকড়া' ('ইহা কড়িও নহে, কোমলও নহে, পুরো সুরে মিঠে কড়া') রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করলেও (দ্র° 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন', মানসী) তারই দ্বারা 'কড়ি ও কোমলে'র নাম চারিয়ে গেছে বহু দূর, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক সুপ্রতিষ্ঠা হবার পরেও তার সংস্করণ হয়েছে। এ কালেও সজনীকান্তের ব্যঙ্গ বা প্যারডিকে তাঁর প্রচার বলেই জ্ঞান করেছেন জীবনানন্দ এবং অন্যেরা তুষ্ণী থাকলেও ব্যঙ্গ সুপ্রণীত হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে (দ্র° সজনীকান্ত দাস : 'মাইকেলবধ কাব্য' এবং এই বইয়ে 'গাণ্ডীবী' কবিতা)।

বিলিতি রিয়ালিজ্মেরই এক ধারা এই ব্যঙ্গ কেননা মুখ্যভাবেই সে সমাজবাস্তবাশ্রয়ী। কেবলই নিঃসক্ত স্বভাবানুকৃতি নয়, didactic, সুনীতিনিষ্ঠ, গোচর গোপন দুর্নীতি-বেনিয়মে তার নজর ও কটাক্ষ, হয়তো ক্রোধও, এবং কঠোর হাসিতে রাশ টেনে ধরার কর্তব্যবুদ্ধি। কিন্তু কমিক ট্রাজিক, রঙ্গ বা নিগ্রহ দু ভাবেই তার প্রকাশ হতে পারে। পুরাতন গ্রীক দার্শনিকের সূক্তি পড়ি : বড়ো ট্রাজিক কবি বড়ো কমিক কবিও

হবেন কেননা সে সমপ্রতিভার দুই স্ফূর্তি। কমিকে-করুণে মিশ্র হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ লেখা। মুহূর্ত-পরিস্থিতি বুঝতেও ট্র্যাজেডি-কমেডির দু দিক মিলিয়ে পড়ার বিধি। দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও দেখি, বীরনারী ব্রজনারীর বিরহ-ব্যাকুলতা যিনি বোধ করেছিলেন আর জীবনের নরকদর্শন করেছিলেন মহাকাব্যে তাঁরই ক্রুদ্ধ প্রহসনে শঙ্কিত হয়েছিলেন সমকালীনেরা এবং সেই হাস্যে বীররসে বিপ্রলম্ভে গ্রথিত হয়ে আছে সে সময়ের পূর্ণায়তন। বঙ্কিম যে লিখেছিলেন 'হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে', নিতান্তই সে সমাজপ্রত্যক্ষরহিত বলে। অস্ত্রাঘাতকারী পরিহাস বা নরঘাতিনী রসিকতাকে তিনি ইয়োরোপাগত কুসামগ্রীর মধ্যে গণ্য করেছিলেন যদিও অন্যত্র স্বীকার করেছিলেন 'যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে।' কে বা কী—দুঃখ নয়, ব্যঙ্গেরই যোগ্য, তার মীমাংসা তিনি করেন নি। কিন্তু তার ফলে, অকারিতার প্রতিক্রিয়াতে সে যদি হয়ে ওঠে ক্রুদ্ধ প্রহসন? অপরোক্ষেই পাপকে তিরস্কৃত, মেকিকে উপহসিত করা যার উদ্দেশ্য? সমাজের কদর্যকে কদর্য ভাষায় পর্যুদস্ত করা যার স্বভাব? বিশুদ্ধ রুচির অননুমোদিত দীনবন্ধুর যে প্রহসন বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয় বলে বঙ্কিম নির্বন্ধ করেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তেরই অধৌত ছাপ দেখতে পেয়েছেন তাতে রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মণোচিত শুচিতায় নির্মল করে তুলেছিলেন যাকে ঈশ্বর গুপ্তেরই অপর সুগণ্য শিষ্য। যদিও নিমচাঁদ আর কমলাকান্তের মধ্যে একটুখানি ক্রমই আছে মাত্র। দুজনেই সমাজবিভঙ্গ থেকে পৌঁছেছেন হৃদয়ের তলাতলে, পরিহাস থেকে আত্মকরুণায়। বঙ্কিম কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্বেষহীন ব্যঙ্গ, বা রঙ্গের কথাই বলেছেন বড়ো করে : তাঁর ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই; শত্রুতা ক'রে, অনিষ্ট কামনা ক'রে কাউকে গালি দেন না, 'মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ,... কেবল আনন্দ, যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে একটা চড়, নহে একটা কানমলা দিয়ে ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য।' সমাজবিভ্রাটের কটাক্ষমূলক নিজ প্রহসনের প্রস্তাবনাতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও একই কথা বলেছিলেন

প্রথমতঃ গ্রন্থখানি সমাজের চিত্র
হয়েছে অঙ্কিত তাতে যে সব চরিত্র,
উদ্দেশ্যে নয় এ প্রকার, যে ব্যক্তিবিশেষ
লক্ষ্য ক'রে তাঁরে করা ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ।
নিয়ে নব্যবঙ্গ, করা একটু রঙ্গ
উদ্দেশ্যটা; হয়ে পড়ে সঙ্গে একটু ব্যঙ্গ,
নেবেন ভালোভাবে, তা'লেই চুকে যাবে...
মন্দই কি? না হয় একটুকু কাহার
চড়ই দিলাম, কিংবা দুটো গালই দিলাম, যা হয়,
ভালো, বন্ধুভাবে; —সে কি মরে যাবে?

বঙ্কিম লিখেছেন, ঈশ্বর গুপ্তের 'তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু, শিখি নি শিং বাঁকানো,/কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।/যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা, গামলা ভাঙ্গে না।/আমরা ভুসি পেলেই খুশি হব, ঘুসি খেলে বাঁচব না' ইত্যাদিতে মহারানীর স্তুতি করতে দেশি এজিটেটরদের কান ধরেও কিছু টানাটানি আছে, বিষয়ের অতি যথার্থ্য সত্ত্বেও এবং তাতে কেউ ম'রে না গেলেও ক্রোধের কালি মুছতে পারেন নি কবি, যেমন 'একঘরে' লিখে মান্য কাগজের 'ইহাতে... কঠোর প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু তাহা অসঙ্গত অমূলক শ্লেষবাক্য নহে' ব'লে প্রশংসা পেলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, 'একঘরে' লিখে শত্রু মিত্র সকলের কাছেই তিনি গালি খেয়েছিলেন, এবং 'মূর্ত হাস্যের অবতার' ব'লে বন্দিত হলেও ওই হাস্যসৃষ্টিরই ফলে হয়তো ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছিল তাঁর অকালমৃত্যু। আজও দেখতে পাই সজনীকান্ত দাসের অপর যাবতীয় সুকৃতি আচ্ছন্ন হয়ে আছে 'শনিবারের চিঠি'র টিপ্পনির কালিতে, তাঁর সরস কবিতার কথাও কেউ বড়ো মনে রাখেন নি।

৩

'তুমি মা কল্পতরু...' কবিতার কেবল হাসিটা নয়, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দেখবার বিষয়।' 'আষাঢ়ে'র হাস্যরসপ্রধান গল্পাকার কবিতার আলোচনাস্থলে গল্পের সূত্রে সামাজিক কপটতার উপরে কবির সহাস্য টিপ্পনির পরেও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ছন্দের ঝোঁকে ঝোঁকে স্ফুলিঙ্গসৃষ্টি, বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনার পরিপূর্ণ অন্ত্যমিল-পরম্পরা, এবং মন্তব্য করেছিলেন, 'এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।' 'হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার' থাকলে তবেই স্থায়িত্ব হয় লঘু কবিতার। সমাজ অধ্যাত্ম দুইবিধই হতে পারে চিন্তা ও ভাব, কিন্তু তার চাইতেও সবিশেষে তিনি বলেছেন 'নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের', 'ছন্দের অস্খলিত পারিপাট্যের' তাতে অত্যাবশ্যকতা। গুরু কবিতায় ছন্দ-মিল অধুনা অভীষ্টলাভে বাধা বলে গণ্য হলেও লঘু কবিতায় ছন্দ বা ছন্দোবৈচিত্র্যের যে অনন্ত দাবি, বোধ করি তা সর্বৈব সুপ্রণীত হবার সুবাদে, বাহ্য বা গুহ্য যাই হোক তার চিন্তা, ভাব বা বস্তু, সমাজ সমাবেশের যোগ্য সাজ তাজ তার না হলেই নয়। তথাকথিত কবিগানও মহড়া চিতেন অন্তরা কিংবা বিশদতরভাবে চিতেন পরচিতেন ফুকা মেলতা মহড়া সয়োরি অন্তরা-র সুনিয়মিত বিন্যাসে বাঁধা, গায়েন দোহার বাজনদার নির্দিষ্ট যাথাযথ্যে সে রচনা বিস্তার ও সম্পূরণ করতেন (দ্র° প্রফুল্লচন্দ্র পাল : 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' ১৯৫৮ ভূমিকা পৃ ৬১-৬৭ এবং সুশীলকুমার দে-র পূর্বোল্লিখিত বই সং ১৯৬২ পৃ ৩০৭-৩০৮)। ঈশ্বর গুপ্তের 'নীলকর' কবির সুরে বাঁধা, হয়তো 'গঠনের পারিপাট্যে' শ্রাব্য থেকে পাঠ্য ও প্রশংস্য হয়েছে; তাঁর যমকপ্রাবল্যও হয়তো পয়ারকে প্রচল পাঁচালি থেকে তফাত করে আনতে, অন্তত তাঁর 'এক দুই তিন চারি

ছেড়ে দেহ ছয়/পাঁচেরে করিলে হাতে রিপু রিপু নয়' এই শ্লেষবৈদগ্ধ্য পালাকার গীতকারের এক ধ্বনির পুনঃপুনঃ আবৃত্তির অসহায়তা থেকে (রাম বসুর গানেও পৌনঃপুনিক 'কূল' শব্দের সুলভ চাতুরীতে রবীন্দ্রনাথ বিব্রত হয়েছিলেন) বেরিয়ে আসার প্রয়াস। হেমচন্দ্রের 'সহর বন্দনা' বা 'কড়ি ও কোমলে'র স্থূলচরবর কিংবা সম্পাদকদের সমীপে লেখা পত্র-কবিতার সরসতাও স্বরবৃত্তে ঢোলের বোল, অথবা লোকালোক শব্দের গুরুচণ্ডালী গেঁথে তুলে : 'তোর গুণে নমস্কার— ও তোর গুণে নমস্কার', 'তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবৎ না ভাষতে'—'সস্তা লোকের ঢাক পিটোনো' কি 'জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল', যাদের ফেনিল বাক্যবন্যা তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়— তাদের থেকে তফাত হয়ে আসতে। কাব্যভাষার যে 'গতিশক্তি' দেখা গিয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায়, এই বাক্যবন্যার তোড়কে অন্তর্লীন করে লেখ্য কবিতাবন্ধের একটা বিকল্প সে, অন্তত অনুশীলন সে কারণে, তার মধ্যে কবির হৃদয় এবং সে হৃদয়ের মধ্য থেকে জ্বালা ও দীপ্তিও ফুটে উঠেছে। এবং রূপ চিত্ত সব মিলে সরস কবিতার আদর্শ সুষমা ও সুমিতির দিকে তার সন্ধান। সাঁটে বলা, তির্যক্ প্রণালীতে বলা উদ্ভট প্রহেলির যে (সচিন্ত সূক্তি ব্যতীত) ধারা সংস্কৃত আমল থেকে দেশভাষায় সুচলিত ছিল, একটা ক্ষুদ্র ভাগ সে লঘু কবিতারও, 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন, নামে ধ্রুপদী বই হয়েছিল তার এ দেশেই ; 'কণিকা', 'লেখন', 'স্ফুলিঙ্গ' গড়ে উঠেছে পরে তারই বারুদে, কিন্তু একটা পূর্ণ সুখভোগ্য কবিতা যা ঘরোয়ানা গ্রাম্যতা মুছে বিশদ শিষ্ট বেশ পরে এসে দাঁড়াতে পারে, হাতে ভয়াস্ত্র নেই, থাকলে গূঢ় হয়ে আছে মনোগত ক্রোধ বৈরূপ্য বিতৃষ্ণা, বরং সুখে বিধুর দুঃখে বিনোদ হয়ে কথা বলছে, তার ঈষৎ নমুনা হয়তো দেখতে পাব 'মন্দ্র' বা 'ক্ষণিকা'য় (দ্র° এ বইয়ে 'সুখমৃত্যু' ও 'অনবসর' কবিতা) যা কোরাসের ধুয়ো দেয়া হাসির গান বা ক্ষুদে ক্ষুদে আর্য ও স্বদেশি বীরদের নিয়ে তিক্ততা মাত্র নয়। 'খাপছাড়া' বেরোবার পর বুদ্ধদেব বসুকে পরিতাপ করতে দেখি : 'ইংরেজি বুক অব লাইট ভর্স একটি অফুরন্ত আনন্দের খনি... আমরা বাঙালিরা যে হাসতে জানি নে এমন তো নয়, কিন্তু আমাদের পদ্যের রাজ্যে হাসির আনাগোনা নেই বললেই হয়। ' দ্বিজেন্দ্রলালের 'উচ্চ হাসি' (ইন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের হাসিকে বলেছিলেন emotional), সুকুমার রায়ের 'ননসেন্সে'র দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন, পারমিক সরস কবিতা বলে বোধ হয় তাকে মানতে পারেন নি, 'এমন হাসি, যেটা হো হো হাসি নয়, যাতে বিদ্রূপের চাইতে রসিকতাই বেশি, সংস্কার চেষ্টার চাইতে নিছক রসতারই যেখানে স্থান, যা আকারে সুডৌল ও সুঠাম, খামকা বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করে না, যা উৎকৃষ্ট পদ্য— এমন কি কখনও কখনও ভালো কবিতা— যা হাসাবার চেষ্টা করে না, ভালো সঙ্গ দেয়, যাতে ভালো মেজাজের হাওয়া, ভালো আড্ডার ফুর্তি— এমন কবিতা বাংলাভাষায় বড়ো দুর্লভ।' বুদ্ধদেব লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে 'খাপছাড়া' তা হতে পারত। ইচ্ছে করলে 'প্রহাসিনী'র চেয়ে উচ্চতর প্রহসনও তিনি লিখতে পারতেন,

কিংবা বৈকুণ্ঠের চাইতে গভীরতর ট্র্যাজিকমিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু স্বপরিচায়িত ছেলেমি খ্যাপামি উদ্‌ভ্রান্তিক অনাসৃষ্টির আপতিক প্রতিভাসের কিছু বিস্তার মাত্র দেখি খেয়াল-স্রোতের ধারায় ডোবা-ভাসা 'ছড়া'র অন্তিক কটি অবচেতনার অবদানে, হুঁশ আছে তখন 'সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি', কিন্তু সে সভ্যতার সংকটের দুঃখ ছাড়া দুঃখবিনোদন, বা ট্র্যাজিক প্রহাস জমে নি কলমে। হর্ষীশ্বরের অপর্যাপ্ত হাসির ঢেউ লাগা বাতাস গায়ে লাগে নানা দায়িত্বের অবরোধ ভেদ ক'রে, হাসি-তামাসাকে ছ্যাবলামি বলার মতো বুড়ো তিনি কখনও হবেন না— এই তথ্য বা মান্যের বাইরে আপন গল্পকে নাট্যিfy ক'রে তাঁর দিন কাটতে পারে, কিংবা প্রথম জীবনে ভালো লাগা মেয়েলি ছড়ার আধুনিক পাঠান্তর তৈরি করে ('ছেলেভুলানো ছড়া'র উদ্‌ধৃতি থেকে 'প্রহাসিনী'র কবিতা) , তার চেয়ে নতুনতরে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য হবে না। অজিত দত্তকে নির্বন্ধ করেছিলেন বুদ্ধদেব, 'তিনি যেন হালকা কবিতা আরো লেখেন।' 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেবের নিজের লেখাও পড়ি : 'পিষ্ট হলেম সুবুদ্ধি ও দুষ্ট ইকনমিক্‌সে...' কিংবা 'নগর-সংকীর্তনে'র সময়োচিত কটাক্ষ : 'গরিবরাই সুখী রে ভাই, গরিবরাই সুখী'—

> ওদের পুষতে হয় না বিশটা চাকর, মস্ত বাগানবাড়ি,
> রকমারি ঝকমারি নেই, নেই কোনো দরকারই
> (ও ভাই গরিবরাই সুখী)
> ওদের দিন কেটে যায় জুটলে ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা কড়াই;
> আর এমনি কপাল! দিব্যি চলে মোটরগাড়ি ছাড়াই
> (ও ভাই গরিবরাই সুখী)

বোধ হয় এ লেখাই সুরূপিত হয়েছে 'বারোমাসের ছড়া'র 'হিতোপদেশ' কিশোর কবিতায়। গভীর কবিদের তত দূর যে তিনি প্রবর্তনা করতে পারেন নি তার কারণ হালকা কবিতা দিয়ে কবিতার জনপ্রিয়করণের যে অবধান করেছিলেন অডেনের সম্পাদিত লঘু কবিতার বইখানি আলোচনা-সূত্রে (দ্র° 'চতুরঙ্গ', চৈত্র ১৩৪৫) : যে কবিতার ভাষা সহজ, লয় দ্রুত, বিষয় দৈনন্দিন জীবন, উপজীব্য হাস্যরস ও লোকশিক্ষা, আর পাঠকের 'জুজু' যে কবিত্ব তা উচিতরকমের কম বলে ব্যাপকরকমে গ্রাহ্য; এবং লিখেছিলেন, 'আমার প্রস্তাব এই যে এই জাতীয় কবিতার বহুল প্রচলন দ্বারা পাঠকের এই জুজুর ভয় ভেঙে দেওয়া হোক... এইভাবে কবিতার পাঠক সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে', উচ্চ কবি অবসরবিনোদন বলেও হয়তো তা মানতে পারেন নি। সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের চিৎভার বা বাক্‌কূট দূরে থাক, জনবাদী বিষ্ণু দে - সমর সেনের অভূত থীম ও বয়ানে বাঁধা বাঁকা লেখাও স্নাতক পাঠকের ভোগ্য, অমিয় চক্রবর্তীর অপেক্ষাকৃত খোলা রঙদারি অতিরিক্তভাবে শিষ্ট এবং বিদেশিগন্ধী, পরন্তু কবিতায় আবহমানের বদলে সাময়িক বা সদ্যতন পরিস্থিতির সত্য ও বোধ এঁরা লিখতে চান গুরু বা লঘু

কলমে, কিন্তু সে লঘু কলমও তাঁদেরই কাটা কলম। তা ছাড়া সামাজিক দৌরাত্ম্যের যে সূক্ষ্ম বা চোরা দংশন এঁদের ব্যঙ্গের বিষয় পাঁচাপাঁচি পাঠকের হয়তো তা গম্য নয় অনেকাংশই। হ'লে বিষ্ণু দে-র প্রসার হত, সঙ্কোচ হত না। রবীন্দ্রনাথ গৃহস্থপাড়ায় বাস নিতে পারেন নি বলে আক্ষেপ করেছিলেন, আধুনিক কবি বলেছেন একই পাড়ায় বাস করেও পড়শিসমাজের কথা বা ভাষা তাঁর নয়। বিষ্ণু দে ব্যক্ত পরিহাস স্থলেও লিখেছেন

হাসির নেই কোনোই অধিকার
অথচ তবু হাসতে হয় চোখের জলের ভয়ে।

চোখের জলের ভয়ে ফোটানো হাসি কি সর্বসমাজের ভাগাভাগি হতে পারবে? বলছেন : 'শহুরে গোয়ালে, উপমায় নয়, বাস্তবে করি বাস', কিন্তু তার পিঠে-পিঠেই কবি বলছেন ইতরতাময় বলে সে বাস্তবে দুঃখেরও মহিমা নেই। সেই 'বিশ্বব্যাপ্ত সাহারায়' লোকে সর্বত্র ঝুলছে দুলছে 'দৈনন্দিনে ফাঁসির চড়কে', কিন্তু চড়ক দেখবে কে? সেখানে 'কেই বা কাকে হাসে / যেখানে প্রায় সবাই শিকার'? কবি এই সাধারণ জনসাধারণের অন্তর্গত বলে আপন পরিচয় এগিয়ে দিলেও কি সাধারণ্যে ভাগাভাগি হতে পারবে এই সরসতা? বুদ্ধদেব যে লোকশিক্ষা ও হাস্যরসের সাবলীল ছন্দোবন্ধের কথা বলেছেন, সনাতন রাবীন্দ্রিকেরা তার যোগান বন্ধ করেন নি, বিলিতিমার্কিনের সংখ্যানুরূপে না হলেও এখানেও অনেকেই ছিলেন যাঁরা সরস লঘুভার কবিতার কবিতাকার, মুখ্যত গুরু কবিও অনেকে স্বতন্ত্র হাসির কাব্য ছেপেছেন। সেদিকে বুদ্ধদেবের নজর যায় নি সম্ভবত তাঁদের মুহূর্তবুদ্ধির অনটনে, কিংবা অনপনেয় দিশিয়ানার কারণে। যে অজিত দত্তের উপরে ভরসা করেছিলেন, মর্মগতভাবে এঁদেরই তিনি বি-গোত্রও নন, যদিও বুঝেছেন 'সত্য কথায় চোখ বুজে আর ফল কী? বার্তা নিয়ে আবির্ভূত কল্কি', কিন্তু তিনিও ব্যঙ্গের চাইতে টান বোধ করেছিলেন রূপকথায়।

৪

ক বছর আগে এক প্রাত্যহিকীর শারদীয় বইয়ে খ্যাতিমান এক কার্টুনচিত্রী অপ্রতিবাদে মন্তব্য করেছিলেন আধুনিক বাঙালির সরস সাহিত্য কিছু নেই। হয়তো সত্যি প্রসর নেই আজ তার, যা ছিল শীর্ণ হয়ে এসেছে তারও ধারা। মঞ্চে পঞ্চরং নেই, সঙের জুলুস উঠে গেছে যার জন্যে অমৃতলালের মতো সুলেখকও পদ্য বাঁধতে পারতেন, 'বঙ্গদর্শনে'র কমলাকান্ত হয়ে গেছেন 'আনন্দবাজারে'র কমলাকান্ত, শিব্রামের চুটকি ফুরিয়ে গেছে, 'বসন্তক', 'পঞ্চানন্দ', বা 'শনিবারের চিঠি', 'সচিত্র ভারত', অচলপত্রে'র মতো কাগজ বেরোয় না, 'যষ্টীমধু'র হাস্যগতপ্রাণ সম্পাদকের তিরোধান হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'প্রভাকরে' প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের হাস্যপূর্ণ 'জামাই ষষ্ঠী' কবিতা 'বঙ্গসমাজে এতাদৃশ সমাদৃত হইয়াছিল যে সেই সংখ্যক প্রভাকরখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত তাহা প্রতি খণ্ড আট আনা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন।' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কেবল 'ছুচ্ছন্দরী বধ' কেন, হেমচন্দ্রেরও আলোড়নকারী একাধিক সরস কবিতা

মুদ্রিত করেছিলেন। গত শতকের শেষে সরলা দেবী লিখেছেন (দ্র° 'বাঙ্গালার হাসির গান ও তাহার কবি', ভারতী, ফাল্গুন ১৩০১), 'আমাদের হাসির গান কোথায়? যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিতান্ত পক্ষপাতী তাঁহাদেরও... ইহার অভাব অনুভব করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের প্রিয় কবির অগাধ সঙ্গীত-সমুদ্র মন্থন করিয়া মরিলেও হাসির গান মিলিবার নহে... এই দুর্ভিক্ষের রাজ্যে হঠাৎ যদি একটা হাসির ভাণ্ডার আবিষ্কার করা যায় তবে কী অত্যানন্দের কারণ হয়। সে ভাণ্ডারাধিকারী — কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।' শ্রাবণ ১৩৪৭ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকার মন্তব্যেও পড়ি, 'দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের প্রথম ও শেষ হাসির কবি।' ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের মতো 'অনাবিল হাসি উদ্রেক করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না' আর সুকুমার রায় লিখেছেন শিশুদের জন্য, 'হাসির কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার দাবি তাঁর নাই।' এ সংখ্যারই আগে-পরে ধূর্জটিপ্রসাদ সমর সেনের 'প্রধানত সামাজিক, যার প্রতীক এই কলকাতার জীবনযাত্রা, সেই ব্যর্থতা'র কবিতার উল্লেখ করেছিলেন (ব্যর্থতাজড়িত বক্রতার নয়), এবং জীবনানন্দের 'প্যারাডিম' কবিতায় 'অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে / যেখানে সম্ভ্রম করা অনুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতে হেসে' কমেডিকোরাসের স্বস্তিহারী সুভাষিত বিবৃত করে গিয়েছিলেন — কোনোটারই গ্রাহক ছিল না সমাজমণ্ডলে কেননা সরসতা বলতে ভালো আড্ডার ফুর্তি যা ভালো সঙ্গ দেয়, অথবা হাস্যোজ্জ্বল লোকশিক্ষা, তার বাইরে সংস্কার গড়ে ওঠে নি এখানে।

আজ উঠেছে কি? জনযুক্ত জনোপযোগী আমোদের বিকল্প হয়ে এসেছিল আশাবাদ। বিষ্ণু দে দোটানার দ্বন্দ্ব ঢাকেন নি। সমর সেন লেখায় ইস্তফা দিয়েছিলেন। আর, স্বভাবক্রমী কালো প্রহাস মুলতুবি রেখে জীবনানন্দ সই দিয়েছিলেন তাতে। এই অসমাজী কালো ছাপ তারপর কোথাও হয়তো ঈষদ্‌ব্যক্ত হয়েছে চল্লিশে বা পঞ্চাশের অস্ফুট দু-একটা উচ্চারণে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আদি এক চতুর্দশপদীতে হঠাৎ চোখে পড়ে যায় 'কুচকাওয়াজ-অন্তে গাইল পুলিশেও রবীন্দ্রসংগীত', এবং 'প্রতিপ্রাপকতা'র হিসেবি বুদ্ধিতে আলোড়িত না হয়েও ন্যূনতম কিছু কবিতার লেখক, 'হায় ...বলিল না, ... কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি।' কটাক্ষ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে অচিরে, নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠার প্রয়োজনে। আর-এক কবির অসম্বৃত হাসির এই ক-ছত্র এইরকম:

> দশতলা পাষাণপুরী ধসিয়ে হাসছে হো হো করে।
> অরোগীকে মৃত্যুর ইলাজ ফুঁড়ে হাসছে ফুর্তিতে।
> একবাড়ি আগুন ধুঁইয়ে হাসছে দমকল, গলগল হাসি তার
> আহ্লাদে চারিয়ে যায় ঘর থেকে ঘরে।

তারপর অডিয়োভি স্যুয়ালের 'মস্ত স্ক্রিনে শ্রাদ্ধবাসরের সভাপতি ভাষণ' শেষ হতেই দেখা গেল 'সাবানরূপসীর / হাত পা ব্রা আর প্যান্টি খুলে ছিঁড়ে হাসি আর হাসি —

খিল ধরা পেট ফাঁসা হাসি...', কালিদাস রায়ের 'নাড়িভুঁড়ি তাসিয়ে' দেয়া হাসি নয় কেননা ওতপ্রোত সময়শ্বসিত হয়ে উঠেছে এই হাসি। বহুমুখী হাওয়াদূষণে আধুনিকের কৌলীন্য বোধ হয় এমনই ধসে গেছে।

কিন্তু যে লেখা আজ সবার সুখদ বলে প্রচারিত পপ্ কবিতা, সবার সংযুক্ত যে জীবনমুখী গান, সেই দেখি হয়ে উঠেছে কবে ভ্রংশ আধুনিক বা উত্তর-আধুনিকের মান্য অভিব্যক্তি, তার রস-সরসেরও যথার্থ নমুনা। বোতাম-টেপা সংস্কৃতির সচ্ছলতা দেখতে পাই আজ এ দেশেও হয়তো তার অদ্বিতীয়তাও, যদিও ততদূর সমসাময়িক হয়ে না উঠলে প্রকট অবনমন ক্রিয়া (desublimation) বলেই তাকে মনে হয়। বুদ্ধদেবের পঞ্চাশ বছরেরও আগের নির্বন্ধেও ফের নতুন ক'রে চোখ পড়ে, যদিও তাঁর আড্ডার ফুর্তি বা কবোষ্ণ সঙ্গের সুসমাজে আগে-দিনের বাঙালি সমাজবন্ধনের অবধান নেই। লোকায়ত ছড়া-তরজার বয়ানে নয়া বক্তব্য লেখার যে প্রবণতা অন্নদাশঙ্কর থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় দেখতে পাই, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতিপ্রাণিত প্ররোচনাতেও যা একটা সাবলীল আবেগ তৈরি করে তুলেছে, পুরাতনের সঙ্গে মেল বাঁধারও সে একটা প্রণালী। ঐতিহ্যের প্রবহমাণতার যোগে আত্মস্থ হবার একটা সমগ্র, বা metanarrative তৈরি করে নেওয়ার এই লক্ষণ ছন্ন ছিন্ন পোস্টমর্ডান আজ যে চোখেই দেখুক, পরিশেষে বলি, আমাদের এ সংকলনে পুরোনো প্রথাবিহিতের সেই ভরসাকেই আমরা বরং আশ্রয় করতে চেয়েছি সবিস্তারে, এবং শ্রদ্ধাসহকারে। আর সে কারণে 'আধুনিক' কথাটির সূত্রে কালো লেখার তত্ত্বকথা যাই থাক (যদিও মানতেই হয়, 'ভূমিকা করিয়া হাসা — সে যে মারাত্মক!) , দৃষ্টান্ত স্থলে পরিচিত সরস নির্ভার রঙিন লেখা দিয়েই ভরতে যত্ন করেছি বই, যাতে কয়েক দণ্ডের সুখসঙ্গী, অন্তত সুখস্মৃতি হতে পারে আগ্রহী পাঠকের। ইতি কলকাতা অগস্ট ২০০০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা আধুনিক সরস কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮১২-১৮৫৯

দিন-দুপুরে চাঁদ উঠেছে

'দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত্ পোয়ানো ভার।'
হোলো পূন্নিমেতে অমাবস্যে, তেরো পহর অন্ধকার ॥
এসে বিন্দাবনে বলে গেল, বামী বষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম অষ্টমী,
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পূজার দিন এবার ॥ ১
সেই ময়রা মাগী মরে গেল, বুকে মেরে শূল,
বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টি জলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হল ছারেখার ॥ ২
ঐ সূয্যিমামা পূব্‌বু দিকে অস্তে চলে যায়,
উত্তর দখিণ্ কোণ থেকে আজ, বাতাস লাগচে গায়,
সেই রাজার বাড়ির টাট্টু ঘোড়া,
শিং উঠেছে, দুটো তার ॥ ৩
ঐ কলু রামী, ধোপা শ্যামী, নাচতেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কজন,
কাল্ কামরূপেতে কাগ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার ॥ ৪

পৌষড়ার গীত

এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই
জুটল নাকো পুলি পিটে,
যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার হাজার
মোর্তেছে লোক কপাল পিটে।
ভাত না খেয়ে উদর ভরে
কত দুঃখী গেল মরে;
চেলের বাজার শস্তা করে
দেয় না রাজা ঢেঁড়া পিটে।
ঘরে হাঁড়ি ঠনঠনান্তি
মশা মাছি ভনভনান্তি
শীতে শরীর কনকনান্তি,
একটু কাপড় নাইক পিটে।
দারা পুত্র হনহনান্তি,
অস্তি-নাস্তি ন জানান্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চান্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে।
আদ্‌পেটা ভাত ক-দিন খাব,
দু-দিনেই তো মরে যাব,
পেটের জ্বালায় জ্বলে বুঝি
বেচতে হল কোটা-ভিটে।
ভিটে গেলে যথা তথা
'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ
কাঁদতে হবে বসে ঘাটে

ফস্কে গেল 'আস্কে' খাওয়া,
চেলের পানে যায় না চাওয়া;
তিল নারকেল তেলের দাওয়া,
টাকায় দু-খান নাগরী চিটে।
গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা
হাতে মাত্র দু-গাছ শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে।
রুক্ষ হাতে গিয়ে ঘরে
কাছেতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাক্‌রা বুড়ো ন্যাক্‌রা করিস'
বলে দেবে খ্যাংরা পিটে।
পৌষপার্বণ গেল সাদা,
হল নাকো বাঁউনি বাঁধা,
ঘরে বসে মিছে কাঁদা,
মলেই যাবে সকল মিটে।
যার কাছে যাই মাথা খোঁড়ে
দুটো পয়সা নাহি জোড়ে,
পায়ে গেল জামড়ো পড়ে
বাড়ি বাড়ি হেঁটে হেঁটে।
জ্ঞাতকুটুম্ব দুঃখে মরে,
চাল কোটা নাই কারও ঘরে,
ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হয়ে
মরে কেবল মাথা কুটে।
মেয়েগুলো বেঁধে খোঁপা
তবু মুখে করে চোপা,
পুরুষগুলো তাদের কাছে
পারে নাকো কথায় এঁটে

রান্নাঘরে কান্না হাঁটি
তথাচ না বাক্যে আঁটি,
একেবারে হলেম মাটি
কাঁদিয়ে দিলে কথার চোটে।
ভিক্ষে করি চুরি করি
ঘাড়ে বোঝা বয়ে মরি
খাবার কুমির কেবল তারা
তাদের তো না...
কাঁসারী পসারী কত,
ছুতোর ধোবা 'মামা' যত,
তারাই খাচ্ছে রাজার মতো
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে।
নিত্যি আনে নূতন কড়ি
ভেটকি মাছে কুমড়ো বড়ি,
জাতকুটুম্ব ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে।
তাজা ভাজাপুলি দিয়ে
আয়েস পুরে পায়েস খেয়ে
হেঁকুর হেঁকুর ঢেঁকুর তুলে
শুচ্ছে সুখে ছাপর খাটে।
জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে
কার কাছে না পারি যেতে,
বিষ-হারানো ঢোঁড়ার মতো
অভিমানে মরি ফেটে।
পেট পুড়ে যায় অনাহারে
ফুটে নাহি বলি কারে,
ধ্যান করে সেই বিধাতারে
লুকিয়ে কাঁদি এসে মাঠে।
মাঝে মাঝে উপবাসী,
পোড়ার মুখে তবু হাসি,

বেড়াই যেন খোদার খাসী,
দিবানিশি হাটে বাটে।
হাসিও পায় কান্না ধরে,
এবারে ভাই অনেক ঘরে
বৌ-শাশুড়ি ননদ-ভেজের
চুকলি করা গেল উঠে।
পূবের বাড়ির সেজোদাদা
দু-খান গয়না দিয়ে বাঁধা
এনে দিলেন কিছু কিছু
ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে।
তাই দেখে 'বৌ' রেগে মরে,
কোনো কিছু থাকলে ঘরে
বেচে খেতেম বাঁধা দিতেম,
শোধ যেত শেষ খেটেখুটে।
যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে,
নানা মতো গড়ে তারা
খাচ্ছে সবাই বেঁটে চেটে।
মুখের পানে ছিলেম চেয়ে
'দুখান-একখান যাও না খেয়ে' —
একটিবারও এমন কথা
বল্লে না কেউ মুখটি ফুটে।
হলে পরে মুচি হাড়ি
গিয়ে যত বাবুর বাড়ি
সাপুর সুপুর জুবড়ে দাড়ি
মেরে দিতেন পাতড়া চেটে।
বামুনবাড়ি গেলে পরে
ডেকে না জিজ্ঞাসা করে,
শহর সুদ্ধ ঘরে ঘরে
বেড়িয়ে এলাম ঘুঁটে ঘেঁটে।

পাতের এঁটো যাহা ছিল
একটি বামুন দিয়েছিল
ঘাঁটা ঘোঁটা কাঁটা চাটা
খেয়ে গেল বমি উঠে।
ডেকে নিয়ে সমাদরে
শ্রদ্ধা করে দিলে পরে
এঁটে উঠে থেবড়ে বসে,
পেটে পুরি সেঁটেসুঁটে।
যদি আনি মেগে পেতে—
পেট ভরে পাব না খেতে,
মিছে কেবল গন্ধ করা
মুখে দিয়ে একটু ছিটে।
দেখতে পেলে চৌকিদারে
ধরে দেবে কারাগারে,
নৈলে ঢুকে ওদের ঘরে
আনতে যেতেম লুটেপুটে।
শান্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ি,
গেলে পরে মারে বাড়ি,
ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে
যেতে হবে কলের ঘাটে।
এ-পাড়ার কর্তা বুড়ো
নিত্যি মারেন পাঁটার মুড়ো,
খুড়ো আমার ভাইপো বলে
একটি দিন না দিলেন বেঁটে।
দয়াল বাবু কোথায় আছে
পূরবে আশা গেলে কাছে,
দয়াল নয় সব কয়াল বাবু,
হাড়ে টোকো মুখে মিঠে।
গোরাচাঁদের মেলায় যাব,
মেলায় গেলেই হেলায় পাব,

দুঃখী দেখে দয়া করে
অম্নি দেবে চিঠি কেটে।
পূজা করে ভক্তিভরে,
পূজা করায় ঘরে ঘরে,
দুশো পাঁশশো সাতশো হাজার
যত দিলে লিখে চিঠে।
এমন দাতা আছে কে বা
সুখে করায় উদর-সেবা,
পিটে-পুলির ছিটে গুলি
মারবে কসে আমার পেটে।
ভালো ঘরে জন্ম লয়ে
একেবারে গেলাম বয়ে,
দিন-মজুরি খেটে খেতেম
হলে পরে নগ্‌দা মুটে।
শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কানে
তবু কতক বাঁচি প্রাণে,
কেবল ভেকভেকানি সার হয়েছে,
কার কাছে তা বলব ফুটে।
নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা
আমার হয়ে খাবে তারা
মনকে আমি প্রবোধ দেব
হাত বুলায়ে তাদের পেটে।

ইংরাজি নববর্ষ

খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর।।
চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা - ঘর।।

মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস্।।
শ্বেত পদে শিলিপর শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা।।
চিকণ চিরুনি চারু চিকুরের জালে।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িতেছে গালে।।
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।।
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্য-ভরা।
অধরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা।।
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিক্।।
মনোলোভা কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবিণ উড়িছে কত ফর্‌ফর্ করি।।
ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধ'রে।
বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।।
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুমি মাছি।
তোর মত গুটি দুই পাখা পেলে বাঁচি।।
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি দম্পতী হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন ঘেরিয়া।।
উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি বগীর উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে।।
খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল।
এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই হুল।।
কখন গাউনে বসি কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভিজে গায় পাখা নাড়ি সুখে।।
নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয়।।

শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর।।
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা।।
বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিরেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে।।
কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্।
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঢক্ ঢক্ ঢক্।।
চুপু চুপু চুপ্ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্।
সুপু সুপু সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্।।
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্ ফস্ ফস্ ফস্।
কস্ কস্ টস্ টস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্।।
হিপ্ হিপ্ হুর্ রে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক্ দিস্ গ্লাস্।।
সুখের সখের খানা হ'লে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান।।
গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল।।
আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনই দেখিতে পাবি কত মজা চপে।।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক্।
যত পার ক'সে খাও টেক্ টেক্ টেক্।।
সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে ধরা দেখি শরা।।
করি ডিম আলুফিস ডিসপোরা কাছে।
পেট পূরে খাও লোভ যত সাধ আছে।।
গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে ব'স গিয়া বিবিদের ঘেঁষে।।

রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম্।
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম ।।
পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম?
সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্ ।।
সিন্দূরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুল্কি ।।
ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ।
কখন দেখে না পর-পুরুষের মুখ ।।
এইরূপে হিন্দুরামা শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো অন্ধকারে থেকে ।।
কোথায় নেটিভ লেডী শুন শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল ।।
দিশী কৃষ্ণ মানি নেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয় ।।
ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে।
ধর্মাধর্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে।।
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব ।।
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা ।।
পাতরে খাব না ভাত গো টু হেল কাল।
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরম্ ভাল ।।
পূরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ।
এখনই সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ।।

নীলকর

মহড়া

কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া মা গো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে সুখ আর নাহি স্পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে,
এমন সোনার বর্ষে, খাসের বর্ষে
কেবল বর্ষে যাতনা।
'আসিয়া' আসিয়া মা গো করুণাময়ী
করুণাচক্ষে দেখ না।।
নামেতে নীলের কুঠি হতেছে কুটি কুটি
দুখীলোক প্রাণে মারা যায়,
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুঠেল সব সাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে সাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, পেঁকো গন্ধ তার।
ও মা, একে মনসার ফোঁসফুসুনি, ধুনোর গন্ধ তার।
হলে চোরের কাছে ধর্মকথা
মর্ম কভু বোঝে না।।

চিতেন

হল নীলকরদের অনররি মেজেষ্টরি ভার,
কুইন মা মা মা মা গো।
হল নীলকরদের অনররি মেজেষ্টরি ভার।
পড়েছে সব পাতরবক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে
বিচারে রক্ষে নাইক আর।

নীলকরের হদ্দ লীলে নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ,
যত প্রজার সর্বনাশ।
কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হল কালের খোন্তা, লোন্তাজলে চাষ,
হল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা, চীলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে
শুনে নি কেউ শুনবে না॥

অন্তরা

প্রজা ধচ্ছে আর সাচ্ছে তারা এককালে,
পিটেতে মাচ্ছে খুব কোঁড়া।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোড়া॥

চিতেন

হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ।
কালসাপ কি কোনোকালে দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।
বাঙ্গালি তোমার কেনা এ কথা জানে কে না
হয়েছি চিরকেলে দাস,
করি শুভ অভিলাষ
মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখি নি শিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

অন্তরা

জমি চুনচে, দিন গুনচে কেবল বুনচে বীজ
দোহাই না শুনচে একটিবার।
নীলের দাদন ঠেঙ্গার গাদন, বাঁধন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥

চিতেন

তোমার সাধের বাঙ্গলা হল কাঙ্গলা, সয় না অত্যাচার।
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা জমিদার পড়ে মারা
লাটের দিন খাজনা হয় না আর
কাঙ্গালি বাঙ্গালি যত চিরদিন অনুগত
জানি নে মন্দ আচরণ,
পূজি তোমার শ্রীচরণ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো, মনেতে রাঙ্গা আলো,
টুকটুকেটুক সিঁদূরে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে স্বপ্নে জানি নে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি
তোমার জয়ের বাসনা।

নির্গুণ ঈশ্বর

দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর।
কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥
আমারে দিয়াছ কর, কর তার লও।
করে লিখি তব গুণ, অনুকূল হও ॥
কহিতে না পার কথা, কী রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা 'হাবা আত্মারাম' ॥

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার।।
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত সুতে ছল কেন কর।
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি গুপ্তভাব হর।।
পিতৃ নামে নাম পেয়ে উপাধি ধরেছি
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি।।
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে ভাব গুপ্ত রয়?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত চিত্র করি যবে।
গুপ্ত সুতে গুপ্ত করি গুপ্তগৃহে লবে।।
আছি গুপ্ত পরিশেষে গুপ্ত হবে ভবে।
বল দেখি সে সময়ে গুপ্ত কোথা রবে?
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত সুতে কিসে দিবে ফাঁকি?

প্যারীচাঁদ মিত্র

১৮১৪ - ১৮৮৩

বিবাহসভা

ডিমিকি ডিমিকি তাথিয়ে থিয়ে বোলে নহবত বাজে।
মাধব ভবন। দেবেন্দ্রসদন। জিনি ভুবন বিরাজে।।
অদ্‌ভুত সভা। আলোকের আভা। ঝাড়ের প্রভা মাজে মাজে।
চারি দিকে নানা ফুল। ছড়াছড়ি দুই কুল। বাদ্যের কুলকুল ঝাঁজে।।
খোপে খোপে গাঁদা মালা। রাঙ্গা কাপড় রুপার বালা। এতক্ষণে বিয়ের শালা সাজে।
সামেয়ানা ফর্‌ফর্‌। তালি তাতে বহুতর। জল পড়ে ঝর্‌ঝর্‌ হাজে।।
লেঠিয়াল মজপুত। দরওয়ান রজপুত। নিনাদ অদ্‌ভুত গাজে।
লুচি চিনি মনোহরা। ভাঁড়ারেতে খুব ভরা। আল্পনার ডোরা ডোরা সাজে।।
ভাট বন্দি কত কত। শ্লোক পড়ে শত শত। ছন্দ নানামত ভাঁজে।
আগড়্‌পাড়া কবিবর। বিরচয়ে ওঁহি 'পর। ঝুপ্‌ করে বর এল সমাজে।।

রূপচাঁদ দাস

১৮১৫ - ?

অম্বিকার দুর্গতি

গো মেনকা শোন্ তোর অম্বিকার দুর্গতি,
গাঁজা টেনে শ্মশানে যায় পশুপতি।
মাঠে-ঘাটে বেড়ায় ছুটে কার্তিক গণেশ দুই নাতি ।।
    শৈশব হতে যদি শিখাতে দুটিরে,
    বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ করে,
অনায়াসে দুটিতে বিদ্যা বুদ্ধির জোরে হত হাইকোর্টের বিচারপতি।
    যত হট্টের সঙ্গে থেকে শিখেছে হট্টতা,
    কিরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা,
অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা, কলা বৃক্ষ যার সঙ্গতি।
    দেখ সংসর্গ দোষেতে তোর দশভুজা,
    চণ্ডালের গৃহেতে লয় অগ্রে পূজা,
ভোলা মহেশ্বর দিন রাত টানে গাঁজা, সঙ্গে সব আবাগের সন্ততি।
কহে দীনখগ দ্বিকর জুড়ে, ইঁদুরে ময়ূরে দুটি শিশু চড়ে।
মাতঙ্গীর সিংহ, বুড়োর বুড়ো এঁড়ে, কে দিবে ঘোড়া হাতি ।।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

১৮২২ - ১৮৮৬

নারীসজ্জা

রসিকা [নাপিত বৌ]।... আজি বাঁড়ুয্যের বাড়িতে 'বে', পাড়ার মেয়েরা জল সৈতে যাবে, সাজ গোজ কচ্চে।

দেবল [পূজক ব্রাহ্মণ]। সাজ গোজ আবার কেমন?

রসিকা। তা শুনবে?

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে।
প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে॥
মনোমত সজ্জা করে বিভবানুসারে।
এই প্রথা সর্ব্বকালে সকলই সংসারে॥
মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা।
কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কাণবালা॥
কেহ কেয়াপাত করে কেহ বা চৌদানী।
না ছিল পূর্ব্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী॥
শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল।
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণস্মিতি।
যাহা হেরি যুবজন গণের বিস্মৃতি॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা।
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা॥
কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।
তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয়॥
বাহুতে ধারণ করে কেহ বা কেয়ূর।
হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর॥
কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মোন্ কাটা চিক্
দেখিতে অপূর্ব যাহা করে চিক্‌চিক্॥

পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার।
অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার ॥
রত্নের অঙ্গরী কেহ যত্ন করে পরে।
আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পারে।
কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার।
বিরহি যুবার মন করিতে সংহার ॥
কাহার চরণে ঢেয়ুতরঙ্গের মল।
রজতে নির্মিত যাহা অতি সুনির্মল ॥
কেহ বা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ।
কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ ॥
করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন।
বিবাহবাটীতে দেখ করিছে গমন ॥

ফলার

উদয়পরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণ। উদর (উদরে হস্ত দিয়া)।

কালে কালে সব গেল কি হইল ভাই।
পূর্বমত ফলার নয়নে দেখি নাই।।
থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।
খাইতে খাইতে তাহা হইত অরুচি।।
দিন দিন কত কত জুটিত ফলার।
এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার।।
এমন দুর্ভাগা দেশে মারী ভয় নাই।
ভাবি সদা কোথা গেলে আদ্য শ্রাদ্ধ পাই।।
বিবাহের দফা রফা বল্লালে করেছে।
খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে।।
তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
ফলার সন্ধান করি খুজিয়া খুজিয়া।।

হায় কিছুই হল না। এতটা পরিশ্রম!

পরিশ্রম হল সার, নাহি মিলিল ফলার
ফল আর জীবনে কি আছে।

গৃহ অন্নে নাই রুচি, ত্যজিছি লক্ষ্মীর খুচি,
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাঁচে ।।....

উদরপরায়ণ, স্ত্রী সুমতিকে। হা ক্ষেপি, কিছুই যানিস্ নে, ফলার তিন প্রকার, উত্তম, মধ্যম আর অধম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শুনবি?...

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু-চারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়োই।।
নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড়ো মজা,
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা।।
খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে সুখো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে,
উত্তম ফলার তাকে কই।।

মধ্যম ফলার।

সরু চিড়ে সুখো দই, মত্তমান ফাকা খই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়।।

অধম ফলার।

গুমো চিড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই,
পেটে ভরা যদি নাই হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে,
অধম ফলার তাকে কয়।।

মধুসূদন দত্ত

১৮২৪-১৮৭৩

কলি

আমি কলি ; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী — সে আমার ইচ্ছায়!
ময়ূরের চন্দ্রক - কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি!
জন্ম মম দেবকুলে; অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্মাধর্ম সকলই সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২৭-১৮৮৭

নিষেধিকা

১

অপরূপ কিবা সখি! দেখ কলিকালে
আকাশেতে এক পদ, দ্বিপদ পাতালে।
শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি, মন্দাকিনীধারা,
হে সখি! বামন সে কি ?
— না সখি, ফুয়ারা ॥

২

তাপে তপ্ত চতুর্বর্ণ, করে তাঁর পূজা,
সর্ব শিরোপরে কিবা শোভে অষ্টভুজা।
দ্বিপদে বিপদে তাঁরে না চায় কে সাথী—
হে সখি! অম্বিকা না কি?
— না সখি, সে ছাতি ॥

৩

হে সখি! শুনহ অই ঘন গরজন।
— কহ না সজনি! সে কি হয় নবঘন?
আবার দেখহ সখি! উঠে জ্বলি জ্বলি।
— বুঝিলাম ও লো সই! সেই তো বিজলী!
আলো আনি! করে সেই কর সুশোভন।
— তবে বুঝি হবে সেই বলয় কঙ্কণ॥
আবার দেখহ ওষ্ঠোপরি শোভাকর।
— এইবার বুঝিলাম হইবে বেসর॥
কেমন চতুরা তুমি! বুদ্ধির ধুকুড়ি!
যা বলিলে কিছু নয়, হয় গুড়গুড়ি॥

৪

বৈমাত্রেয় বংশ প্রতি অহিত আচারী,
যাহার নির্দেশে মেঘ বরিষয়ে বারি।
সহস্র লোচন শোভা অঙ্গেতে প্রচুর।
হে সখি! বাসব সে কি ?
— না সখি, ময়ূর।।

৫

তাহার প্রতাপে তাপে তাপিত সংসার
কত শত শত গৃহ করে ছারখার।
জলে না নিভায় তেজ, কাটে তার ঠাণ্ডি—
হে সখি! অনল সে কি?
— না সখি, সে ব্রাণ্ডি।।

৬

নীলনিভ ঘটাধারে বান্ধা আছে বারি,
অতি সুশীতল সেই সর্বতাপহারী।
অই শুন বজ্র শব্দে বর্ষে অনর্গল!
হে সখি! নীরদ সে কি?
— না লো, সোডাজল।।

৭

লজ্জাবতী লজ্জাবশে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
কতই অমৃত ধরে সুবর্ণ শরীরে।
সহজে সম্ভোগ তার নাহি লভে বঁধু—
হে সখি! নবোঢ়া নাকি ?
— না সখি, সে মধু।।

৮

পূর্ব পূর্ব কালে আমি শ্যাম অবতার
লোকের সুরুচি হেতু আর সদাচার।

পরেতে গৌরাঙ্গ হই ভক্তির নিধান
জগতেরে তৃপ্ত করি, করি রসদান।
গড়াগড়ি ধরাতলে, এই পরিণাম-—
হে সখি! কেশব সে কি ?
— না সখি, সে আম॥

৯

সর্ব বর্ণ ভুক্ত সেই নানা দেশে জাত
ঝলমল তনুরুচি, বিভায় বিভাত।
মম লজ্জা সজ্জা সই সেই রক্ষা করে
দিবানিশি আলিঙ্গিয়ে আছে কলেবরে।
জন মনোমোহনের সেই মাত্র অস্ত্র—
হে সখি . বল্লভ সে কি ?
— না সখি, সে বস্ত্র॥

নীতিকুসুম

১

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর, উভয়েই এক বর্ণ ধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়, কে বা কাক কে বা পরভৃত॥

২

কোকিল গর্বিত নহে চুতরস পিয়ে।
ভেক মক্‌মক্ করে কর্দম খাইয়ে॥

৩

ধন আছে যার সুকুলীন সেই নর।
সেই বক্তা, সেই মনোহর রূপধর॥
সেই সুপণ্ডিত, শ্রুতবান, গুণালয়।
সকলের কাছে সেই সমাদৃত হয়॥

৪

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ।
যেই রূপে ইচ্ছা তব কর নিয়োজন।।
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্বে ভজনা।
লিখো না ললাটে ধাতা, লিখো না লিখো না।।

দীনবন্ধু মিত্র

১৮২৯-১৮৭৩

পিরের গান

মাণিকপির, ভবপারে যাবার লা,
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,
মাণিকপির—

আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবি কর সার,
মাজা দুল্‌য়ে চলে যাবা ভবনদীর পার।
মাণিকপির—

শুন রে ভাই বিবরণ, লবদ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বলতে নাহি পারি;
কোরানেতে বয়েদ আছে দুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলই ঝক্‌মারি।
ব্যানে বিকেলে দুপহরে, জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়বা মন্‌ডা করে স্থির;
মানী লোকের রাখবা মান, গোরিব লোককে করবা দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড় গোনা কেজ্‌য়ে করা কাজিকো হয়রানি।
পির প্যাকম্বর মাথায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ার্‌ছে কাম্ কর্‌না ছোড়কে শয়তানি।
ঝুট্‌বাৎমে না দেবা দেল্, সত্যছে বানাবা এক্কেল,
ভক্তিভাবে কর্‌বা পুজো বাপ্‌মার চরণ।
গোনা বরাবর্ নাইকো বিষ, ভনে দ্বিজ গোলামনবিশ,
এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন।
মাণিকপির—

সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ে কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভেতর দুগ্ধু রেখে পিরকে ফাঁকি দিল।
মাণিকপির—

কত কীর্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়।
মাণিকপির—

ও রে কদুকুমড়ো রাক্‌লে ফেলে, তুশ্চু নেরেল ব্যাল,
আজগুবি দুনিয়ার খেলা সর্ষের মধ্যি ত্যাল।
মাণিকপির—

মুসলমানের মোল্লা রে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কদুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।
মাণিকপির—

আশমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ,
আর দিনের বেলায় সূর্যু ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ
মাণিকপির—

পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতি, শিক্‌লি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ি মেগের নাতি খায়।
মাণিকপির—

কত কেরামৎ জানো রে বন্দা কত কেরামৎ জানো,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টানো।
মাণিকপির—

দুর্গির ছাওয়াল কার্তিক রে ভাই মোরগ চেপে যায়
আর পুজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।
মাণিকপির—

রাতির বেলায় ভূতির ডরে ডর্‌য়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়্‌কো মেয়ে ঝম্‌কে ওঠে খসম কাছে এলে।
মাণিকপির—

মাণিকপির, ভরপারে যাবার লা,
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,
মাণিকপির—

বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল।
কল্‌জেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।
মাণিকপির—

সায়েরে গিয়েছে স্বামী হাব্‌লি আঁধার করে,
পরান জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
মাণিকপির—

মুখ ঘামেছে বুক ঘামেছে বিবির বাসে যাচ্ছে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচত নুমাল দিয়ে।
মাণিকপির—

পিঁড়েয় বসে কাঁদ্‌চে বিবি, ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে খসম খসম বলে।
মাণিকপির—

ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে মান্‌ষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা কল্লাম শেষ।
মাণিকপির—

মনোমোহন বসু

১৮৩১-১৯১২

বারোমাস্যা

বারোমেসে দুঃখ তোমার শুনালে যতেক
আমার বারোমেসে তেমনি, শোন্ লো তবে প্রাণসজনি—
পরের শুনলে আপনার জ্বালা জুড়াবে অনেক!...
বৈশাখে বসন্ত পেয়ে সবার সুখের তত্ত্ব :
ফুটে কলি, জুটে অলি, মধুপানে মত্ত।
আমার বঁধু পিপের মধু, পীয়ে আসেন মেতে!
দেখে লোকে হাসে, আমি কিন্তু কাঁদি দিনে রেতে। ১।
জ্যৈষ্ঠ মাসে আঁব-কাঁঠাল সকল ঘরে ঘরে;
খায় ফেলে বিলোয় লোকে তত্ত্বতাবাস করে।
আমার ঘরে কে আন্‌বে ভাই? যদি বা তত্ত্বে আসে;
চাটের জন্যে বাইরে নে যায়, ব্যায়রা সর্বনেশে!
তিনশো টাকা মাইনে পায়, ভূতে উড়োয় সব—
মাইরি দিদি ঘরে কেবল নেই নেই নেই রব! ২।
আষাঢ়েতে পর্ব ভারি — রথে জগন্নাথ;
আমার প্রভু পথে হয় তো থাকেন চিৎপাত!
মট্ কদ্‌মা মেঠাই মণ্ডার সাধ্ তো গেছে ঘুচে;
এমন জন কেউ নাইকো দিদি, ফুট্‌কড়াই দে পুছে! ৩।
যত পড়ে শ্রাবণের ধারা, ততই তাঁর বাড়ে কুধারা—
নয়নধারা বেগে আমার বয়;
বর্ষাকালে বাতের ভয়ে, বেশি মদ খেয়ে খেয়ে,
শুতে এসে মাথা গরম— হয় তো বমি হয়! ৪।
ভাদ্র মাসে জলের তরঙ্গ থৈ থৈ;
নেশার তরঙ্গে বঁধু — সঙ্গে ইয়ার, বারবধূ—
সহরে ঘুরে বেড়ান সুধু, ক'রে হৈ হৈ!

লক্ষ্মী-পূজো আধা মাসে, লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড বাসে,
দেখে দেবী ঊর্দ্ধশ্বাসে, ত্রাসে ফিরে যান;
দূরে থেকে কোপনয়নে কুদৃষ্টিতে চান!
তারই ফল সই হাতে হাতে, সকল থাক্তে এই হাবাতে
দশা ভুগতে দশের কাছে হয়—
সংক্রান্তিতে কত জাঁকে, অরন্ধন ভোজ করে লোকে,
আমার হয় তো কর্ম্মের পাকে, অরন্ধন না কল্লেই সে দিন নয়! ৫।
আশ্বিনে পূজোর ধুমে বাবুর বেশি ফুর্ত্তি;
হয় আল্‌পাকা সাটীনে কত চায়নাকোট কুর্ত্তি!
টিকিট মারা জুতো; আর বাক্স ভরা মদ্;
এনে পোমেটম্ আর অডিকলম্ ভাবে গদগদ্!
ন-পোয়া বহরের আসে নয়ানসুক এক থান—
মাঠক্‌রুণকে দুখান ঠেঁটি, ঝিকে দেয় একখান;
বাকি থান ম্যাজেন্টা দিয়ে ছুপিয়ে ব্যায়রা লয়;
ছেঁড়া চাপকান্ কুটির্ টুপি, বখ্‌শিস্ তারে হয়!
ননদ ছুঁড়ির সাড়ি একখান কিন্তেও ভুল হয় না;
আমার বেলাই হরেক রকম উঠে নূতন বায়না!
বারাণসী তো মহাদোষী: ঢাকাই মনে লয় না;
গাউন দিতে রাজি, কিন্তু অভাগীর তা সয় না!
মেজাজ বুঝে, ঘেঁষে ঘুঁসে, কাছে একবার যাই;
গিয়ে বলি 'রাঁড়্‌কে দেও গে— আমার ও কাজ নাই!'
এম্নি করেই ঘর করি সই, নিত্যই নূতন সই;
তুমি হ'লে ম'রে যেতে— আমি যাই তাই রই!
পূজো-আচ্ছা নেম্‌নিমেসা, সকল হল রদ্;
রাত দিন্ কেবল রব শুনি 'দে মদ, দে মদ!'
বাঁকা তেড়ি; বাঁকা ছড়ি; পায় বাঁকা বুট;
বাঁকা মেজাজ; বাঁকা মুখে কথা ড্যাম্ হুট্;
ওয়াচ গার্ড গলায় ঝোলে, ট্যাঁকে ওয়াচ ঘড়ি;
জোটে না বাবুদের কেবল দড়ি-কল্‌সীর কড়ি! ৬।

কার্ত্তিক অঘ্রান নূতন হিমে, নেশা আর ঘুম!
রাত পোয়ালেই প'ড়ে যায় খোঁয়ারি ভাঙার ধুম!
পৈতৃক এক পুরাণো সাল, থেঁতলে থেঁতলে চিরকাল,
হয়ে গেছে খুব বেহাল— জীর্ণ জরা কাবু;
কার্ত্তিক পুজোর দিন হ'তে, গুচিয়ে তারে কোনোমতে,
গায় দিয়ে কার্ত্তিক সাজেন বাবু!
হয় তো গেলেন সন্ধ্যা বেলা, সকাল বেলা তা ফালা ফালা,
রিপু কর্ত্তেই দর্জির পো খায় হাবুডুবু! ৭। ৮।
পৌষ মাসে হৌস থেকে নগদ মাল আসে—
বড়ো দিন আর ছোটো দিনের ছুটি ছুটাবার আশে!
বাইরে ঝোলে গাঁদার মালা, ঘরের ভেতর র‍্যাঁদার জ্বালা,
বৈঠকখানায় টেবিল কোলে ডেবিল দল বসে;
হোটেল থেকে আসে খানা, খ'টেল ইয়ার জোটে নানা,
কিন্তু "গো টু হেল" ভাষে, যদি উঠ্‌নোর মুদী আসে!
ঘরে নাস্তি কড়াক্রান্তি, কিসে কাটে পিটে-সংক্রান্তি?
বল্লেই বলে 'নেই মানন্তি— ফাই ফাই' ক'রে ধমকে উঠে সই;
বলে 'ছোটো লোকের পরব ওটা— ওতে আমি নই'! ৯।
মাঘ মাসে লাগ পাই নে— নানা কারখানা—
রাঁড়ে ভাঁড়ে বাগানে ইংরেজিতর খানা!
প্রতি ইয়ার বাগান দেন প্রতি শনিবার!
প্রতি হপ্তা প্রতি বাবুর বাড়ে শুঁড়ির ধার!
শ্রীপঞ্চমী !— আমার পক্ষে বিশ্রী দেবী তিনি;—
দুষ্ট সরস্বতীরূপে, বারোমাস তার ঘাড়ে চেপে,
দুখিনীরে নাথ থাক্তেও কচ্ছেন অনাথিনী।
নাথ নাকি নাথের বাগানে— প্রধান আড্ডার স্থান যেখানে—
সরস্বতী পুজো এনে, করেন মহা জাঁক;
নিমন্ত্রণ হয় অঙ্গ বঙ্গ, তথায় নাকি করেন রঙ্গ—
দেশহিতৈষী ব'লে যাঁদের নামে বাজে শাঁক ! ১০।
ফাল্গুন মাসে অন্যের বাড়ি রাধাকৃষ্ণের দোল।

মদের ধারে বাবুর বাড়ি শুঁড়ির গণ্ডগোল!
সমবয়সী সব রূপসী সুখে খেলে ফাক।
শাশুড়ী বৌ আমরা দেখি, চালের জালা ফাঁক! ১১।
চৈত্র মাসে শুঁড়ির ধার খুব শানিয়ে ওঠে—
সেই শ্রাদ্ধ গড়ায় গিয়ে ছোটো আদালত কোটে!
শমন গেল, ওয়ারিন এলো, সীল পড়্‌ল কপাটে—
গা-ঢাকা অন্দরে বাবু— হায়! তবু ফ্রেণ্ড জোটে।
আফিসের যে জমাদার, তার কাছেও হ'য়েছে ধার, সেও নিত্যই হাঁটে!
শেষে, চাক্‌রি গেল, খবর এল, তবু কাক ছোটে!
তবু মারেন রাজা উজীর— দম্ভে মাটি ফাটে।
কার্ সাধ্য নিকটে যায়, ইংরেজি বোলের চোটে! ১২।
ঐ বারোমেসে কথা সাঙ্গ না হতে অমনি,
খুঁড়ী ঝি এক ছুটে এল— হাস্য-বদনখানি;
বলে 'বখ্‌শিস্—বখ্‌শিস্—বখ্‌শিস্ চাই— ঐ গলার ঐ হার!
বাড়ি এসেছেন বড়োবাবু— হবেন্ "গলার হার" তোমার!!
মাইরি, বউদি! গাড়ি দেখ্‌লেম ফটকের কাছে—
উঁকি মেরে দেখে মুখ্‌টি, ছুটে এলেম ফুলিয়ে বুক্‌টি,
আগে খবর দেওয়ার সুখটি, আর কেউ পায় পাছে!'

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৩-১৯০২

বিবাহ

বর সাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে লোক জাগিয়ে জানিয়ে যায়
আজ শ্বশুরবাড়ি সোনার বেড়ি পরিতে চলিলাম পায়।
যাবজ্জীবন কারাবাস তায় মনে কত উল্লাস,
গলায় দিয়ে প্রেমের ফাঁস বেদেনী বাঁদর নাচায়।
ঠুলি দিয়ে টাকায় ঘানি, বার করে তেল, খাওয়ায় ছানি,
হাঁকায় মেরে পা-র গুঁতানি, চড়ে আর পাথর চাপায়।
হতে হয় শেষ ধোবার গাধা, চড়ে, চাপায় লাদার গাদা,
ডাকায় হাঁকায় মেরে গদা, ছোলা-ঘাস দুটো না পায়।
ভরে না বাসনার খাদ, পেতে সাধ গগনের চাঁদ,
সদাই মুখে দে দে নাদ, বজ্রনাদ চেয়ে চমকায়।
কেউ করে খেদ বউ না পেয়ে, কেউ পেয়ে দুখ বেড়ায় গেয়ে,
দিল্লীর লাড্ডু কেউ বা খেয়ে, কেউ বা না খেয়ে পস্তায়।
জড়ায় যেই আঠাকাঠিতে, উড়তে যায়, পড়ে মাটিতে,
জুড়াতে ভবের ভাটীতে হরি-ভজন বই আর নাই উপায়।

প্যারীমোহন কবিরত্ন

১৮৩৪-১৮৭৪

কলের জল

বিপদ কল্লে কলের জলে, এ জলে অনেকে জ্বলে, গালে হাত
ভাবছে বসে ডাক্তার-কবিরাজ সকলে।
কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারদের শনির ভোগ, বাবুগিরির ঘোর
গোলযোগ, দানা পায় না আস্তাবলে।।
প্রকাণ্ড এমন শহরে, রোগ নাইকো কারু ঘরে, একটি দিন না মাথা
ধরে, সবাই আছে কুতূহলে।
রাম-নাম-সত্য বাণী, শুনে কাঁপে মহাপ্রাণী, খোট্টাদের মুখে সে
বাণী, শুনি না গলিজ মহলে।।
ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না মলো, নিমতলা বন্দ ছিল,
তিন দিনে একটা না জ্বলে।
যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোঝা বোঝা, তাদের বিপদ
নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জ্বলে।।
জানাচ্চে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে, রোগ পাঠাও জনপদে,
হাত তুলে কেবল কপালে।
হেল্‌থ্‌ আফিসর এবারে, পুরস্কার পেতে পারে, উপকারে উপচারে,
দেখে কবিরত্ন বলে।।

যাবার সময়

ও রে মন, তোমারে আজ বাদে কাল ভবে পটল তুলতে হবে।
এখনও উপায় আছে, ভেবে না ভবানী ভবে।।
কোথা থাকবে বাড়ি, ঘড়ি— পড়ে গড়াগড়ি যাবে।
গালপাট্টা কটা গোঁফে কে আদরে আতর মাখাবে।।

পোমেটম্ হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে।
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা গান করে কে প্রাণ জুড়াবে।।
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ি হাঁকাবে।
আরামে আরামে গিয়ে খুশি হয়ে খাসী খাবে।।
রম্ টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে।
দুটি নয়ন করে রাঙ্গা রগ টেনে কে কথা কবে।।
টানা পাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় বাতাস খাবে।
ফুলের তোড়া সামনে রেখে সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে।।
রোগ হলে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দেবে।
তখন কুইল ধরে উইল করে পরের হাতে দিতে হবে।।
এখন একটি পয়সা ব্যয় করো না মহামায়ার মহোৎসবে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচ ভূতে সব লুটে খাবে।
খাটে তুলে ঘাটে যখন সুঁদ্‌রী-কাঠে সাধ মিটাবে।
প্যারী বলে, যাবার সময় মোসাহেব কি সঙ্গে যাবে?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৮-১৯০৩

হুতোম প্যাঁচার গান

সহর বন্দনা

কলির সহর কলকাতাটির পায়ে নমস্কার!
যার জাঁক্‌জমকে ভাগীরথীর দু-ধার গুল্‌জার,
যার কোলের কাছে ঘাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান,
যার মাঠের ধারে বাড়ির বাহার দেখলে জুড়োয় প্রাণ,
যার পাথর-ইটে পথ বাঁধানো 'ফুট্‌পাথ' দোধারি,
যার পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি,
যার তিন দিকে জল সহর ঘেরা— উত্তরে বাহালি
আহা বাগবাজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী,
আর অজ্‌দখিণে আদিগঙ্গা টালির নালা হালি!
যার মাথার দিকে পাইকপাড়া খুরে খিদিরপুর,
যার পূব্বু ঘেঁষে সূঁড়ো টালি ঘোঁজে আলিপুর,
যার ইটদালানে খোলার চালে ঠেকাঠেকি গায়,
যার গির্জে মসীদ ঠাকুর বাড়ির চূড়োয় আকাশ ছায়,
যার বাজার গলি বিষ্ঠেনলি বাইরে জ্বলে ঝাড়,
যার বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া, মেথর হাঁকায় ষাঁড়!
যার টাউন্‌ যোড়া পল্লী দুটি সাহেব নেটিব পাড়া,
যার চৌরঙ্গী সোনার থালা সহর ধুলোর হাঁড়া!
যার গ্যাসের আলো রাত্রিকালে চক্ষে লাগায় ধাঁধা,
যার কোলে দোলে লোহার সাঁকো এদিক্‌ ওদিক্‌ বাঁধা!
যার রাস্তা ঘরে সহর ফুঁড়ে কলের পানি ছোটে,
যার দুধের কেঁড়েয় খাঁটি পানি তিন পো ছেড়ে ওঠে!

যার দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাজাই সাঁচা
যার লম্বাটে গোচ চেহারাটা ফজলি আমের ঢাঁচা,
আহা ভাগীরথীর দুকূলযোড়া রূপের ছটা যার,

কলির সহর কলকাতা তোর পায়ে নমস্কার!
তোর পায়ে নমস্কার!

তুই রাজার নগর আজব সহর ভারতভূমির হার!
তোতে মুক্তো পলা কতই আছে শালুক-শোলা আর!
আজ তুলে তুলে দেখব খুলে চিকণ্‌তা কি কার!
দেখব রে তোর ভোজের বাজী, দেখব রে তোর ফুলের সাজী।
দেখব রে তোর রাংতা-মারা চালখানির বাহার!

কলির সহর কলকাতা তোর পায়ে নমস্কার!!
তোর গুণে নমস্কার — ও তোর গুণে নমস্কার!

কলির সহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার।।
তোর সভ্যগায়ের বাতাসে হয় দ্বিপদ অবতার;
তোর কোলে পিঠে সাদা কালো মহাবীরের মেলা,
যেন কলির মাঝে আবার ফিরে ত্রেতাযুগের খেলা!
তোর কড়ির গুণে শৃগাল সাজে সিংহ-বাঘের ছালে,
তোর ভক্তি-গুণে ভাগীরথী 'পেশাব'-নলে চলে!
তোর বাজার হাটে শোভা করে সকল ফুলের সাজি;
তোর রাজপসারে সমাজ মাঝে সদাই দড়াবাজি!
তোর এলেমগোলা ইংরিজিতে ঘোচে গায়ের মলা;
তোর হালের রীতি গোরু খাওয়া বাবার ভাষা বলা!
তোর জলের গুণে জাত পিরিলি ধুয়ে মুছে খাড়া;
তোর মাটির গুণে দাস্ কৈবৎ বেণে সমাজ সেরা;
তোর ভজন-গুণে ভোজন-কালে সব হাঁড়ি সমান—
ও তোর খেষ্ট-ভজা বেহ্মাচাচা হিঁদু মুসলমান!

তোর নব্য কেতা দাড়ি-রাখা সভ্য প্রথা জারি;
তোর ফুল-বাবুদের ঘাড়ে ছাঁটা সদরে কেয়ারি!
তোর তুড়ির জোরে রায়বাহাদুর— কুস্তিগিরি ভাঁজা;
তোর নেক্‌নজরে আঁস্তেকুড়ে আস্কে গোনা রাজা!
তোর সভ্যমুখে বাংলা বুলি ঠনঠনে পয়জার!
ওরে কলির সহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার!
তুই রাজার নগর আজব সহর ভারতভূমির হার!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮-১৮৯৪

রাজার উপর রাজা

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায় পেলাম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম পেলাম কেবল ঝাঁটা॥
বাসের জন্য ঘর করিলাম ঘর গেল পুড়ে।
বুড়ো বয়সের জন্য পুঁজি করিলাম সব গেল উড়ে॥
চাকুরির জন্য বিদ্যা করিলাম, ঘটিল উমেদারি।
যশের জন্য কীর্তি করিলাম, ঘটিল টিটকারি॥
সুদের জন্য কর্জ দিলাম, আসল গেল মারা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম, শেষে কেঁদে সারা॥
ধানের জন্য মাঠ চষিলাম, হল খড়কুটো।
পারের জন্য নৌকা করিলাম, নৌকা হল ফুটো॥
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম, সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম, ডিক্রীর বেলায় ফাঁকি॥
তবে আর কেন ভাই বেড়াও ঘুরে, বেড়ে ভবের হাট।
ঘূর্ণি জলে নৌকা যেমন ঝড়ের কুটো, জ্বলন্ত আগুনের কাঠ॥
মুখে বল হরিনাম ভাই, হৃদে ভাবো হরি!
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই, এসো লাভে ঘর ভরি॥
এ গুণেতে শত লাভ, শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ, ভাবি ফলাও কারবার॥
ভাই বলো হরি, হরি বলো, ভাবো ভবের হাট।
রাজার উপর হও গে রাজা লাট সাহেবের লাট॥

বিরহিণীর দশ দশা

প্রথম দশা দিনে বেরি বেরি রোওল,
শেজে পড়ি কাঁদে ভূমি লুটি।
দ্বিতীয় দশা দিনে আঁখি মেলি হেরল
শেজ ছাড়ি গা ভাঙ্গিল উঠি ॥

২

তৃতীয় দশা দিনে, মৃদু মৃদু হাসিল,
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ।
চউঠ দশা দিনে, সিনান করি আওল
হাঁড়ি পাড়ি খাওল পান্তা ভাত।।

৩

পঞ্চম দশা দিনে বান্ধি চারু কবরী,
ঢাকাই শাড়িতে দিল ফের।
ষষ্ঠম দশা দিনে, পিঠা পুলি বানাওল
কাঁদিতে কাঁদিতে তার গিলিল তিন সের ॥

৪

সপ্তম দশা দিনে সজিনা খাড়া রাঁধিল
বলে প্রাণবঁধু কোথা গেলে।
যে খাড়া রেঁধেছি ভাই, তুমি বঁধু কাছে নাই,
যদি পেট ফাঁপে একা খেলে।।

৫

অষ্টম দশা দিনে, বিরহ-বিষাদিনী
মন দুঃখে কিনিল ইলিশ।

তিতিয়া নয়ন জলে, ভাজায় ঝোলে অম্বলে
খায় ধনী খান বিশ ত্রিশ ॥

৬

নবম দশা দিনে, পেট ফেঁপে ঢাক হল
আইল কানাই কবিরাজ।
সই বলে কর্মভোগ, এ ঘোর বিরহ রোগ,
কবিরাজে নাহি ইথে কাজ ॥

৭

দশম দশা দিনে, বিরহিণী মরে মরে
আইঢাই বিছানায় পড়ি।
কাতরে কহিছে সতী, কোথা পাব প্রাণপতি
কোথা পাব পাচকের বড়ি ॥

৮

বিরহীর দশ দশা, পন্‌পন্‌ করে মশা,
মাছি উড়ে, ছেলে কাঁদে কোলে।
চাকরাণীর চীৎকার, সইসাঙ্গতির টিট্‌কার
খেদে কবি ছন্দোবন্ধ ভোলে ॥

কালীপ্রসন্ন সিংহ

১৮৪০-১৮৭০

আজব সহর কল্‌কেতা

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোনার বেণের কড়ি,
খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখরাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।
গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০-১৯২৬

গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য

প্রথম সর্গ

প্রবীণ সাধুর সঙ্গে, বিপ্র-যুবা বিনা ভঙ্গে,
বহুকাল সখ্য-ডোরে বাঁধা।
বয়সের যে অনৈক্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
সে অনৈক্যে প্রীতির কি বাধা।।
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, উদয় হইল মনে,
বোলপুরে করিব গমন।
সুরম্য প্রত্যূষ কাল, নিবেদয়ে দ্বারপাল,
'অশ্ব রথ প্রস্তুত রাজন্।।'
আনন্দ উল্লাসে দোঁহে, চলে মহা সমারোহে
নিমেষে পাইল গঙ্গাকূল।
মুহূর্ত্ত না বিলম্বিতে, নিরখিল আচম্বিতে,
ভাগীরথী মহা হূলস্থূল।।
ব্যোমে উড়াইয়া ধূম, শব্দে কাঁপাইয়া ভূম,
হন্‌হন্ আসে বাষ্পযান।
ঝাঁকিল লোকের পাল, ক্ষুদ্র গাড়ি লয়্যে মাল,
বেগে ধায় ব্যথিয়া পরাণ।।
রবিতাপে পেয়ে ব্যথা, ছায়াতরু-তলে যথা
পথিক জনের ঘুচে খেদ।
তরণীর বাতায়নে পদ মাত্র পরশনে,
সব দুঃখ হইল বিচ্ছেদ।।
আসন গ্রহণ প্রতি, দোঁহার না হল মতি,
ইতস্ততঃ করে সংক্রমণ।

দৈবের কি দেখ লীলা, জামা গায় স্বল্প ঢিলা,
উত্তরিলা এক মহাজন ।।
শুভ্রকেশ শিরে ছাঁটা, যেন সজারুর কাঁটা,
অধিকাংশ নয়ন গোচর!
অবশিষ্ট অংশোপরি টুপি শোভে আহা মরি,
তেলোমাত্রে করিয়া নির্ভর ।।
দেহখানি শুষ্ক শীর্ণ, কে বলিবে জরাকীর্ণ,
অস্থিগুলি আছে মজবুত।
বয়স সোত্তোর ষাটি, খাড়া তবু যেন লাঠি,
পরাজয় মানে রবিসুত ।।
মানুষটি নির্ব্বিবাদী, ভদ্রতা বিনয় আদি
জিহ্বামূলে অনাহূত আসে।
নাহি বাধা নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি কোন ভাল মন্দ,
মনে যাহা বাক্যে পরকাশে ।।
মৃদু মন্দ ধীর গতি আইলেন তিনি তথি,
যাত্রী দোঁহে দাঁড়াইয়া যথা।
সহজ মিষ্ট ভাষায় পরিচয় জিজ্ঞাসায়
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিল কথা ।।
মোকর্দ্দমা ছিল তাঁর, সম্ভাবনা জিতিবার.
করিলেন তাহার বাখান।
এই বলিলেন শেষে, "সে কালে ছেলে বয়েসে,
ইংরাজে আছিল ভাল জ্ঞান ।।
আছিল প্রত্যয় দড়, ওরা সত্যবাদী বড়,
ভুলেও না কহে মিথ্যা-লেশ।
এবে একি চমৎকার, দেখি ভিন্ন ব্যবহার,
বঞ্চক শঠের একশেষ ।।
যৌগাড় করিনু কত, ছ মাস অনবরত
কত ক'ব সে সব তোমায়।

এখন ভরসা হয়, মোকর্দমা হবে জয়,
বড় কষ্ট দিয়াছে আমায়।।'
নিজের কার্যের কথা, অন্যের কি মাথা-ব্যথা,
সে বোধ নাহিক তাঁর মনে।
ভদ্রতার অনুরোধে, তাঁর বাক্য অবিরোধে,
শিরোধার্য করিল দুজনে।।
এতেক যত প্রসঙ্গ, মুহূর্তে হইল ভঙ্গ,
প্রাচীন যাত্রীর পরমাদ।
গোঁপ তাঁর অমায়িক, ছাপিয়াছে দুই দিক,
শ্বেতবর্ণ, এই অপরাধ!
মহাজন গোঁপ-নিষ্ঠ, হইলেন গোঁফাকৃষ্ট,
মন্ত্র-বলে যেন সর্প ধরা।
সভ্যতার বাঁধ টুটি, কহিলেন, মুখ ফুটি,
কথাগুলি উপদেশ ভরা।।
'অমন সুন্দর গোঁপ, ওতে না দিলে কলোপ,
ভবে আসি কি তবে করিলে।
তোমার ও গোঁপখানি, সামান্য ত নাহি মানি,
তপস্যায় কারো ভাগ্যে মিলে!
ব্যয় মাত্র পাঁচ টাকা, একটি না রবে পাকা,
ইথে কেন করিছ কার্পণ্য।
নেড়া-গির্জে যা'বা মাত্র, মিলিবে অতি সুপাত্র,
গুণী মাঝে যিনি অগ্রগণ্য।।
তার হস্তে তব মোচ, পেয়ে কলপের পোঁচ,
অমনি হইবে কালো মিষ।
অনায়াসে হবে ধন্য, যুবা মধ্যে হবে গণ্য,
বয়ঃক্রম উনিশ কি বিশ।।
পাঁচটি টাকার তরে, গোঁপ থাকে অনাদরে,
ইহা ত পরাণে নাহি সয়।

টাকায় কি আসে যায়, টাকা কি গো সঙ্গে যায়!
সৎকাজে করিয়া লও ব্যয় ।।
আমার এ গোঁফখানি এ তো অতি ক্ষুদ্র প্রাণী,
তোমার উহার তুলনায়।
কটাক্ষেতে কল্পের, চেহারা ফিরেছে এর,
ব্যাপারটি ভেলকীর প্রায় ।।
হেন উপদেশ, করি শেষ,
নিজ গোঁফের কেশ, গরবে হেরে।
নেত্র লভি তৃপ্তি, পায় দীপ্তি,
নিখিল গোঁফময়, আদরে ফেরে ।।
(আহা) আপন গোঁফময়
নয়ন ফেরে !
(মরি) নিখিল গোঁফময়,
নয়ন ফেরে !
দুজনা অবাক্ ! লাগে তাক্ !
ফুলিছে মুখ নাক, হাস্যের লাগি।
চাপি রাখে তায়, ভদ্রতায়,
চাপিয়া রাখা দায়, উঠিলে চাগি ।।
ইতি শ্রীগুম্ফ-আক্রমণ কাব্যে
গুম্ফো কেশবিধান নামকোঅয়ং প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ

আরম্ভে নূতন সর্গ, শুন গো পাঠকবর্গ,
সবিনয়ে এই ভিক্ষা চাই।
হও আসি মম সঙ্গী, চতুর্দশ বর্ষ লঙ্ঘি,
উজান বাহিয়া লয়ে যাই ।।
প্রাচীন যাত্রীটি যিনি, বহু পূর্বে তাঁরে, চিনি,
দক্ষিণ প্রদেশে যবে বাস।
গোঁপের গোড়ার কাছে, সবে পাক ধরিয়াছে
রাহুকে বা শশী করে গ্রাস !

একটুকু ক্ষান্ত হও, অৰ্দ্ধ গ্রাস হ'তে দেও,
তাহা নহে, একি বিপরীত !
পাকের সবে শৈশব, এ সময়ে উপদ্রব
তার প্রতি হয় কি উচিত ?
কিন্তু অদৃষ্টের লেখা, খণ্ডে না-ক এক রেখা,
সেই কালে বাবু একজন
মাথায় জরির তাজ, শরীরে জমকালো সাজ,
করিলেন কাছে আগমন ।।
বৃদ্ধ তিনি বিচক্ষণ কিন্তু সক বিলক্ষণ !
দেখিলে তাঁহার ভাব-গতি
মনে হয় অনুমান, আছে জুড়াবার স্থান—
দ্বিতীয় পক্ষের রূপবতী ।।
আপনি সুভোক্তা বড়, অন্যে খাওয়াইতে দড়
দিন-রাত্রি জ্বলিতেছে চুলী ।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, অতিমাত্র উপাদেয়,
ভুঞ্জে লোক দুঃখ-শোক ভুলি ।।
মসলা কোটার চোটে, হামানদিস্তায় উঠে,
ঠুং ঠুং শব্দ অবিরল ।
সৌরভ তথায় কিবা বিচরিছে রাত্রি দিবা,
মনোভৃঙ্গে করয়ে পাগল ।।
এক প্রস্ত ভাজাভুজি, সম্মুখে হইলে পুঁজি
আর তাহা ফিরিয়া না যায় ।
তার পরে উপনীত, লুচি মোণ্ডা মনোনীত,
ফল মূল পরের দফায় ।।
বৃহৎ রুপার থালে, পাচক ব্রাহ্মণ ঢালে,
মাংসের পোলাও গাদা গাদা ।
কি গুণ পাঁঠার হাড়ে অম্বলের তার বাড়ে,
কে বুঝিবে ইহার মর্যাদা ।। *

* পাঁটার হাড়ের (মাংসের নহে — হাড়ের) অম্বলের ইনি সবিশেষ মর্মজ্ঞ ছিলেন ।

কেবল আহার দানে, কভু না সন্তোষ মানে
বলবৎ হিতৈষণা তাঁর।
এবাড়ি ওবাড়ি ফিরি, সব-তাতে কর্ত্তাগিরি !
নাহি তায় বিষয়-বিচার।
ভকতির বেগ তাঁর, সামলায় সাধ্য কা'র,
সাধুটিরে বলিতেন 'মুনি'।
(শ্বেত হৈলে গোঁফ ভুরু, মুনিত্বের হয় সুরু,
• এ তত্ত্বটি জানেন না উনি !)
কি মনে করিয়া এবে, সাধু নাহি পায় ভেবে
এত প্রাতে কেন আগমন !
আস্তে ব্যস্তে ত্বরান্বিত, করি তাঁরে সম্মানিত
বসিবারে দিলেন আসন ॥
বাবুজি ক্ষণেক পরে কহিলা আগ্রহভরে
'প্রস্তাব আমার এক আছে—
ভাবিতেছি পূর্ব্বাবধি! শোনেন আপনি যদি
বলি তবে আপনার কাছে।।
কত আর মৌন র'ব আসন্ন বিপদ্ তব!
এই বেলা হৌন সাবধান।
দেখেন না আরসীতে, কি হতেছে গোঁপটিতে ?
প্রতীকার উচিত বিধান!
হেন গোঁপ মনোলোভা, নিভ নিভ তার শোভা!
আর কি উচিত অবহেলা ?
যদি পরামর্শ চান, কলপ শীঘ্র লাগান!
লাগান কলপ এই বেলা!
মস্ত গুণী— শিল্পী ভারি— অদ্যই পাঠাতে পারি!
কি আজ্ঞা করেন গুরুদেব ?
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, বিলম্বে কার্য্যের হানি
শুভস্য শীঘ্রং অতএব।'
সাধুটি এতেক শুনি, অন্তরে প্রমাদ গুণি
সাত পাঁচ ভাবিয়া কহেন!

'করিলাম শিরোধার্য! কিন্তু প্রকৃতির কার্য
অনিবার্য— মাপ করিবেন।'
বাবুজি সদয় মতি, না বুঝিয়া ভাল গতি
আপাততঃ হইলেন ক্ষান্ত।
সাধু প্রবোধিল মনে বাঁচিলাম এতক্ষণে!
এ কি ঘোর বিপদে আক্রান্ত!
সাধু বিবেচক বটে, কিন্তু না আইল ঘটে—
হিতৈষণা কত বেগ ধরে।
যার যবে চাপে ঘাড়ে, স্বপ্নে না তাহারে ছাড়ে!
চাপা দিলে দাপাদাপি করে।।
রবি না হইতে অস্ত বাবু হন সমীপস্থ,
ভবি কভু ভুলিবার নয়।
সাধু ভাবে মনে মনে, 'পুনর্বার কি কারণে
গতিক বেয়াড়া অতিশয়।'
পূর্ববৎ আক্রমণ, কি কহিব বিবরণ,
বিজ্ঞ বোঝে অত্যল্প বচনে।
গোঁপ লয়ে টানাটানি, দিন রাত্রি নাহি মানি
লাগিলেন সাধুর পিছনে।।
বিনয়েতে সাধু কহে (বুঝি বা খেদাশ্রু বহে—
এইরূপ মুখের আকৃতি।)
'ছাড়ুন ছাড়ুন মোরে, নিবেদি চরণ ধ'রে
জানেন ত আমার প্রকৃতি!'
বাবুর দয়ার্দ্র চিত্ত, সাধুরে করি নিবৃত্ত,
বলে 'সে কি কথা মুনিবর!
এতই অনিচ্ছা যদি, ক্ষান্ত হৈনু অদ্যাবধি;
হবেন না আপনি কাতর।'
এইরূপে দুই পক্ষ, বিস্তারিয়া নিজ পক্ষ
নিঃশব্দে হইল তিরোহিত।

এক দিন বাঙ্গালায় সাধু বসি নিরালায়
ভাবেতে আছেন বিমোহিত।।
দেখেন ইত্যবসরে, (হরে হরে হরে হরে!)
একে নেড়ে তাহে গুপ্তচর!
কিসের কী পাত্র হাতে— কী বস্তু যে আছে তাতে—
সাধুর জ্ঞানের অগোচর।।
সেলামিয়া বারে বারে, আইল সে গৃহ-দ্বারে
সাধু ভাবে 'এ কি পাপ-দৃশ্য।'
বলে সে দুয়ারে থামি 'কলপ-ওয়ালা আমি
পাঠালেন আপনার শিষ্য।।'
সাধু বলে 'একি জ্বালা, এই বেলা শীঘ্র পালা
নতুবা উচিত শিক্ষা পাবি!'
যবন ঢুকিয়া ঘরে কলোপ বাহির করে!
কোথায় গড়ায় তাই ভাবি!
সাধু আর নাই সাধু (কে যেন করিল যাদু)
ফোঁস্ ফোঁস্ করে নাসা-মণি।
রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি— ধরেন ধরেন টুঁটি—
শ্মশ্রূধারী হটিল অমনি।।
চউকাট ঠিকরিয়া, পড়িল সে হাঁ করিয়া
পাড়া-সুদ্ধ পড়িল ঝুঁকিয়া।
যবন ঝাড়িয়া দাড়ি, চলি গেল তাড়াতাড়ি,
দুই হাতে সেলাম ঠুকিয়া।।
জ্ঞান করি লব্ধ, হয়ে স্তব্ধ,
মুখে নাহিক শব্দ, ভাবে মুনীশ
'হইত অগত্যা, নরহত্যা!
খেপিলে রক্ষা নাই মনো-মহিষ!
বেচারা গরিব, ক্ষুদ্র জীব,
দোষ করিল মনিব, ওর কি দোষ!

করিলি সম্পূর্ণ, দর্পচূর্ণ,
রে হলাহল পূর্ণ, দূরন্ত রোষ!
ইতি শ্রীগুম্ফ-আক্রমণকাব্যে
পূর্ব্বাক্রমণনামকোঅয়ং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তৃতীয় সর্গ

চড়িয়া মনের তরি, কালের তটিনী তরি'
ফিরে চল যাই সেই ক্ষণে।
বাষ্পযানে যাত্রী তিন, মনোসুখে যেই দিন
কাল হরে মিষ্ট আলাপনে।।
তরণী তীরের প্রায়, চকিতে ওপারে যায়,
যাত্রী সবে দ্রব্যাদি গুছায়।
পশ্চাতে রাখিয়া পোত, চলিল লোকের স্রোত
পিপীলিকা হারি মানে তায়।।
উগরি ধূমের ধ্বজ, ফুঁসিছে আয়স গজ,
অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে।
গমনের অনিচ্ছায়, বারেক আগু-পিছায়,
তক্ তক্ ধক্ ধক্ দাপে।।
প্রথম ঘণ্টার রোল, লোকের বিষম গোল,
দ্বিতীয় ঘণ্টায় সব চুপ।
গজরাজ অগ্রসরে, ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধরে,
দূরত্বের সংহার-লোলুপ।।
পশ্চাতে শকট-যূথ, দেখিবারে অদ্ভূত,
টানি লয়ে চলিল গৌরবে।
পদ-বিমর্দন চোটে, মেদিনী কাঁপিয়া ওঠে,
বিদরে আকাশ নাসা-রবে।।
সর্বজন হিত-কাম ভদ্রতার এক ধাম,
কলপ-বল্লভ মহাজন।

অল্প উপলক্ষ্য পেলে,　　　　কিবা বৃদ্ধ কিবা ছেলে,
　　সবা প্রতি করেন যতন।।
লঙ্ঘিয়া নগর গ্রামে,　　　　আড্ডায় যখন থামে,
　　করিবর হাঁপ ছাড়িবারে;
মহাজন গুম্ফধারী,　　　　পাত্রে করি ল'য়ে বারি
　　চৌদিকে তাকান বারে বারে।।
সহসা করিতে পান,　　　　না করেন ভাল জ্ঞান;
　　দিতে যান তাহা সাধুবরে।
মনে উপজিতে তর্ক,　　　　হইয়া কিছু সতর্ক,
　　কোন্ জাতি জিজ্ঞাসেন পরে।।
সাধু টানি লয়ে হস্ত,　　　　বলেন 'আমি কায়স্থ,'
　　কহিলেন তবে মহাজন
'সেবি আমি অহিফেন,　　　　যদি অনুমতি দেন,
　　আমি আগে সাধি প্রয়োজন।।
দুধ সহে বিনা ক্লেশে,　　　　আমাদের এ বয়েসে
　　অহিফেন বড় অনুকূল।
অহিফেনে আয়ু বাড়ে,　　　　মজ্‌বুতি হয় হাড়ে,
　　শীঘ্র নাহি পাকে গোঁপ চুল।।'
হেন কথা হৈতে সাঙ্গ,　　　　মাতঙ্গ সে আয়সাঙ্গ,
　　মেমারির আড্ডায় থামিল।
গুছাইয়া দ্রব্য আদি,　　　　মহাজন নির্বিবাদী,
　　শিষ্টাচার করিয়া নামিল।।
হেতায় নিরালা পেয়ে,　　　　পরস্পর মুখ চেয়ে,
　　মনোসাধে হাঁসিল দুজনা।
থামিলে হাস্যের কোপ,　　　　সাধু বলে 'পাপ গোঁপ
　　কামাইলে যায় যে যন্ত্রণা!'
বিপ্র কহে হাস্যভরে,　　　　এমনও কি কাজ করে,
　　গোঁপ তুল্য আছে কি রতন।

কালো গোঁপ মনোলোভা,　　　বাড়ায় মুখের শোভা,
পাকিলেই বিজ্ঞের লক্ষণ।।
গোঁপের অবহেলায়,　　　বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়,
তা দিলে যোগায় আসি তূর্ণ।
মহা মহা গুম্ফী যাঁরা,　　　দিক্‌পাল-সমান তাঁরা,
অবনী তাঁদের যশে পূর্ণ।।
এ কি মোর পাগ্‌লামি!　　　গোঁপের মাহাত্ম্য আমি
বচনে কি ফুরাইতে পারি?
পঞ্চমুখে পঞ্চানন,　　　চেষ্টা পেয়ে ক্ষান্ত হন,
বাণী হন বাণীর ভিখারী।।
শুনিলে সুশ্রাব্য, এই কাব্য, কবি-কুল-অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্ট সিদ্ধি, গোঁপ বৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা।।
পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে।।
ইতি শ্রীগুম্ফাক্রমণ কাব্যে
গুম্ফমাহাত্ম্য নামকোঽয়ং তৃতীয়ঃ সর্গঃ
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ
ইঙ্গবঙ্গের বি

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা

বিলাতে পালাতে ছট্‌ফট্ করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে,
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না।১
পিতা মাতা ভ্রাতা নব শিশু অনাথা হুট করি,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কুর্তা বুট পরি,
সিগারে উদ্গারে মুহুরমুহু ধূমলহরী
সুখ স্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি।২
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে, জীবন ধরি।
ফিমেলে ফি মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।৩
ফিরে এসে দেশে গলকলর বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে উলগতনু দেখে বড় চটে,
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে
দুটা লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।৪

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৮৪২-১৯১৬

দুর্গাবাড়ি দুর্গাপূজা

দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপূজা, বড়ো দেখি জাঁক রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রী ঝাঁকে ঝাঁক রে।।
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল ঢাক রে।
তূরী বাজে, ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাঁক রে।।
রেখেছে ছাগল কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।।
বাবা, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।।
কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্যামা মারে ডাক্ রে।।
দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপূজা, বড়ো দেখি জাঁক রে।।
এখনও রয়েছ কেন হয়ে তীর্থকাক রে।
যত পারো, তত খাও, মধুভরা চাক রে।।
মুখে দিলে, বুদ্ধি বাড়ে, শুদ্ধিটুকু চাক্ রে।।
কেন বাছা, থাকো কাঁচা, ভালো কোরে পাক্ রে।
বাবা, সিদ্ধ হবে বাক্ রে।।
কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্যামা মারে ডাক্ রে।।
দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপূজা, বড়ো দেখি জাঁক রে।।

জগদ্বন্ধু ভদ্র

১৮৪২-১৯০৬

ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য

দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে— দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত— দুর্জয়—
পললাশী বজ্রনখ-আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে
অর্কক্ষ্মারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সু-আশুগ-ইরম্মদ গমে শন্‌শনে।)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎভাগে। হায় রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ-বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,—
(ক্ষ্মাভ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্য মাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্‌মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহুঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণুপরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনির্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্তনে।

সুবিরল তনুরুহে তনু আবরিত,
শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষত মৌলী।
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর।
লম্বোদর-বাহন মূষিক বপুঃ-সম
তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত।
চারুপাদ চতুষ্টয় গমনসময়ে
কি সুন্দর বিলোকিতে! হায় রে যেমতি
চতুর্দণ্ড সহযোগে চালায় নাবিক
ক্রীড়াতরী। প্রতি পদে নখর পঞ্চম
অতি ক্ষুদ্র, সহকার-সম্ভূত কীটাণু
যথা, তাহে তির্যগতা সূক্ষ্মতা কিয়তী!
(বেতস দ্রুমের কিম্বা সূচ্যগ্র তনিষ্ঠ
তথা ন্যুব্জ আকর্ষ্যগ্র ভাগ সমতুল)
সুদীর্ঘ মস্তক, বসুমিত্রাস্য যেমতি—
কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ রদরাজী
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত্র-অভ্যন্তরে।
মৌক্তিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝলমলে,
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত-প্রসাধন্যুপম
সে দশন-আবলি সুষমা কি সুন্দর!
ত্রপিষ্ঠা তরুণ্যম্বক-তুল্য নেত্রযুগ;
উন্মীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত।
সুকোমল মধ্যাহ্নার্ক— মরীচিনিকর
অসহ্য সে দৃশে;— হায় ত্বিষাম্পতি তেজঃ
দিবাভীত-নেত্র যথা না পারে সহিতে
পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক্ আমোদিত
করিয়া গমিছ কোথা? তোমার সৌরভে
দ্রাক্ষাত্মজা শীধুসতী গুরু বলি মানে;
দাস-রাজ-তনয়া সুরভিগন্ধি তব
শরীর-সুরভি যদি লভিতেন কভু,
পরিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম

লইতেন পূতিগন্ধা আখ্যান বিষাদে
(বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)।
মুন্যযভ পরাশর জীবিত থাকিলে,
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব।
জগতের হিতহেতু মলাদন করি
পেয়েছ সুগন্ধ; যথা ব্যোমকেশ শূলী
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশনিলা।
নিরমিতে, ভামিনি! কি সূতিকা-আগার
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ?
পর্ণশালা বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী—
মহেষ্বাস— উর্মিলা-বিলাসী অটবীতে
আহরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে।
যাও, ধনী, যাও চলি বসুধা-গরভে
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে।
হায় রে গরাসে যথা আশীবিষ ক্রূর
মণ্ডূকেরে; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি
পৌর্ণমাসী অন্তে গ্রাসে অত্র্যক্ষিসম্ভবে;
কিম্বা মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা।
ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনা নাম
প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৪৪-১৯১২

রানী মুদিনীর গলি

রানী-মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে, পয়সা নেবে না।
ঠোঙা করে শালপাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে,
তেল মাখা মটরভাজা মোলাম বেদানা।।
চুচ্চুরে হয়ে মদে, এলো চুলে কোমর বেঁধে
হর্-ঘড়ি তামাক দেয় সেধে—
বাপের বেটি মুদির মেয়ে, ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে;
নাচো গাও যত পারো, তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা, পড়ে থাকে যেথা-সেথা,
জমাদার পাহারালার নাইক নিশানা।।

আইস, আলোয় আইস চলে

শ্রীরামপুর স্টেশনে কিনু স্যাকরা ও বামা ঘটকীর গীত

কিনু। যদি সাহেব হবা, মাথায় দেবা জর্ডন নদীর পানি।
বামা। যদি ম্যাম হবা তো আইস খাবা রুটি মাখম চেনি,
উভয়ে। আইস, আলোয় আইস চলে!
কিনু। ধরবা ছুরি চামচ কাঁটা,
বামা। চেবাবা ছাঁচি কুমড়ার ডাঁটা— চিংড়ি দিয়া—
কিনু। শান্কের বিচে থুইয়া,
উভয়ে। দান্য সরাব চুমকে খাবা, মিশায়ে আমানি।
আইস, আলোয় আইস চলে!

কিনু। আঁটবা পেন্টুলুন—

বামা। ঝোলাবা গাউন— সাজবা ম্যাম,

কিনু। বলবা ড্যাম্—

উভয়ে। সাহেব-ম্যামে নাচবা দুজন ধিন্ ধিনা ধিন্ ধিনি

আইস, আলোয় আইস চলে!

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১৮৪৬-১৯১৭

শুক-সারী সংবাদ

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ রোজগারি ছেলে।
সারী বলে, আমার রাধায় গয়না দিবে বলে,
রোজগার কিসের লাগি।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চশমা শোভে নাকে।
সারী বলে, আমার রাধায় খুঁটিয়ে দেখবার পাকে,
নইলে পরবে কেন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের দাড়ি লোলায়িত।
সারী বলে, আমার রাধার চিরুনি চালিত
নইলে জটা হত।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চেন ঝলমল
সারী বলে, আমার রাধার গোটেরই নকল,
কেবল এ পিট ও পিট।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের আলবার্ট টেরি।
সারী বলে, আমার রাধার সীঁথির অনুকারী,
টেরি পেলে কোথা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ হ্যাট-কোট-ধারী।
সারী বলে, রাধার তখন ঘেরালো ঘাঘরি,
সে যে রাই নাগরী।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সাম্যগীতি গায়।
সারী বলে, আমার রাধায় ভুলাবারে চায়,
নইলে বিষম দায়।
শুক বলে, কৃষ্ণ আকুল স্বাধীনতা তরে।
সারী বলে, তাইতে রাধার কোটালী সে করে,
এই দিনদুপরে।

শুক বলে, কৃষ্ণ করেন নারীর উদ্ধার।
সারী বলে, নইলে মন পেত কি রাধার,
হত পায়ে ধরা সার!
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ কোম্‌ত্‌-তন্ত্র পড়ে।
সারী বলে, আমার রাধার পূজা করবে বলে,
কোম্‌ত্‌ রাধা-তন্ত্র।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ বলন্‌টিয়ার।
সারী বলে, আমার রাধা তাতেও আগুসার,
যমুনার ঢেউ দেখছ।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যোগ শিখিতে চায়।
সারী বলে, আমার রাধা মন্ত্রদাতা তায়,
সে যে মন্ত্রগুরু!
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ লেখে নবেল নাটক।
সারী বলে, তাতে রাধার গুণেরই চটক,
তাই পড়ে পাঠক।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ সংকীর্তন গায়।
সারী বলে, বিনোদিনী মহাপ্রভু তায়,
নইলে ভজবে কেন।
কবি বলে, শুক-সারীর বিবাদ সে অনন্ত যমুনা।
গোটা দুই কথা মাত্র দিলাম নমুনা,
বলি লাগল কেমন?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪৮-১৯২৫

গা তোলো রে নিশি

গা তোলো রে, নিশি অবসান, প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
স্ক্যাবেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।

গা তোলো রে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
'বেল ফুল— বেল ফুল—' ঘন হাঁকে মালিকুল,
'বরীফ— বরীফ—' হেঁকে বরফ-ওলা যান।
শ্যাওড়া বনে পালে পাল, ক্যাক্কাহুয়া ডাকে শ্যাল,
আঁস্তাকুড়ে কিচির মিচির ছুঁচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও ক'রে, নেংটে ইঁদুর খাচ্ছে ধ'রে
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।

পড়ল গুড়ুম নটার তোপ, এখনও কি যায় নি কোপ,
একটুখানি দিয়ে হোপ রাখল আমার প্রাণ।
ভোঁদড়গুলো মারচে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকাখুঁকি,
শ্রীরাম বলেন, হে জানকী, ভাঙবে কি তোর মান?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাঙবার নয়,
চরণ ধরো হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রাণ।।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৯-১৯১১

একা

বিঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা।
লাগে ধুবধাব তায় বিষম ধাক্কা।
আহা রোদে চাঁদি ফাটে, ধুলা ঢুকে পেটে
সাজগোজ তার এমনি পাক্কা।
তায় আঁকাবাঁকা গলি, বেগে যেতে চলি,
কায়া মায়া যদি ছাড়য় চাক্কা।
তবে নর্দমায় পড়ি ভাবে গড়াগড়ি,
আঁখি মুদে হেরি মদিনা মক্কা।
তায় দুলকি গমনে, ঝন্-ঝন্-ঝনে
বাজে করতাল ঘুঙ্গুর টেক্কা,
করে কান ঝালাপালা, প্রাণ পালা পালা,
চৈত মাসে যেন গাজুনে ঢক্কা।
যদি বল তার রূপ কেমন, তবে শ্রবণ কর।
কিবা বাঁকা দুটি বাঁশ, শোভে দুই পাশ,
মাঝখানে তার সকলই ফক্কা,
দেয় পাতালতা দিয়ে আসন গড়িয়ে,
ছেঁড়ে যদি পথে, অমনি অক্কা!
দিয়ে লাল কালো সাদা, আশমানী জর্দা,
জোতডুরি এক বুনয় ছাঁক্কা,
আহা অশ্বিনীনন্দন, তাহে বাঁধা রন
প্রাণ করে তার পাঞ্জা-ছক্কা।

রাজকৃষ্ণ রায়

১৮৪৯-১৮৯৪

নামমাহাত্ম্য

জগৎপ্রসন্ন ধনী যুবক, সুবলচন্দ্র জগতের ইয়ার।

জগৎপ্রসন্ন। নামের মাহাত্ম্য-তত্ত্ব কর হে পরীক্ষা।

সুবলচন্দ্র। ডিশে ডিশে আঘাত করিতে করিতে—

যশোদা থুইল নাম 'কচি বাছাধন'।
ভূগোল থুইল নাম 'গিরি গোবর্ধন'।।
ইতিহাস থুইল নাম 'বঞ্চক ক্লাইভ'।
বাইবেল থুইল নাম 'Adam and Eve'।।
ডাক্তার থুইল নাম 'মলেও ভিজিট'।
শৌখিন থুইল নাম 'clean and neat'।।
গুড়ুকে থুইল নাম 'অম্বুরী-খাম্বিরা'।
কাপড়ওলা থুইল নাম 'গজে তের গিরা'।
শঠ থুইল নাম 'পেটে বিষ মুখে হাসি'।
মদন থুইল নাম 'পারদ-গরাসী'।।
বাবুর্চি থুইল নাম 'চপ-কাটলেট'।
বাড়িওলা থুইল নাম 'House to let'।।
ভৌগোলিক থুইল নাম 'সুমেরু কুমেরু'।
গুলিখোর থুইল নাম 'তোড়যোড় মেরু'।।
জজ থুইলেন নাম 'ডিক্রি ডিসমিস'।
মেছুনী থুইল নাম 'তোপ্‌সে-ইলিশ'।
বঙ্গবাসী থুইল নাম 'ধর্মের ভণ্ডামি'।
চাঁদাদাতা থুইল নাম 'নিরেট বোকামি'।।
'Last Night' নাম থুইল থিয়েটারওলা।
গর্ভবতী নারী নাম থুইল 'পাতখোলা'।।

Lover থুইল নাম 'I am thine'।
হেডবাবু নাম থুইল 'Name to sign'।।
উকিল থুইল নাম 'মিথ্যা কথা কাজ'।
'কুইনাইন ভস্ম' নাম থুইল কবিরাজ।।
মোক্তার থুইল নাম 'মিথ্যা মূলমন্ত্র'।
মদমাসখোর নাম থুইল 'কালীতন্ত্র'।।
বাবাজী যতনে নাম থুইল 'সেবাদাসী'।
পাণ্ডাজী থুইল নাম 'টাকা গয়া কাশী'।।
গ্রন্থকার থুইল নাম 'চতুর্গুণ দাম'।
'মাশুল ছ-টাকা' থুইল প্রকাশক নাম।।
সুদখোর নাম থুইল 'টাকা কল্পতরু'।
মনিব থুইল নাম 'ভৃত্য গাধা গোরু'।।
জমিদার থুইল নাম 'প্রজাসর্বনাশ'।
প্রজা সে থুইল নাম 'মোটা অন্ন বাস'।।
'বেত-কানমলা' নাম শিক্ষক থুইল।
'গুরুমারা বিদ্যে' নাম ছাত্র সে রাখিল।।
তস্কর থুইল নাম 'লোহার সিঁধকাটি'।
কন্যেকত্তা বরকত্তা থুইল 'পাঁটা-পাঁটি'।।
পঞ্চানন্দ মাটি হয়ে নাম থুইল 'মাটি'।
গরিব থুইল নাম 'আমড়ার আঁটি'।।
বাঙ্গালি থুইল নাম 'আজন্ম গোলামী'।
কালেক্টর থুইল নাম 'নম্বরী নিলামী'।।
হাইকোর্ট থুইল নাম 'আইন লঙ্ঘন'।
সিবিলিয়ান থুইল নাম 'শমন শাসন'।।
শৌণ্ডিক থুইল নাম 'জল ঢালা খাঁটি'।
লেঠেল থুইল নাম 'মানুষ-মারা লাঠি'।।
গোয়ালা থুইল নাম 'কসাই মহাজন'।
মুদী থুইল নাম 'কাঁটা-দাঁড়ির ওজন'।।

মাতাল থুইল নাম 'শুঁড়িদাদাই মামা'।
ফলারে থুইল নাম 'চিঁড়ে ধামা ধামা'।।
নিষ্কর্মা লোকেরা নাম থুইল 'দলাদলি'।
বওয়াটে ছোঁড়ারা নাম থুইল 'ঢলাঢলি'।।
ইন্‌স্পেক্টর নাম থুইল 'স্বরচিত গ্রন্থ'।
পোষ্যপুত্র নাম থুইল 'বিষয়ের অন্ত'।।
কৃপণ থুইল নাম 'চিৎহস্ত সার'।
উড়ুনে শৌখিন নাম থুইল 'টাকা ধার'।।
কুড়ে সে থুইল নাম 'বিছানা গুড়ুক'।
কাহার বেহারা নাম থুইল 'হুড়ুক'।।
জুয়োরি থুইল নাম 'তেতাস প্রমারা'।।
আড়কাটি খুইল নাম 'নরনারী-ধরা'।।
'নবীন নাগর' নাম থুইল নাগরী।
নাগর থুইল নাম 'রসের নাগরী'।।
'জগৎপ্রসন্ন' নাম থুইল সুবল।
'চৌধুরী লেজুড় করি' অন্তরে সম্বল।।
ইতি শ্রীনতুন-পুরোনো পুরাণে নামমাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী

১৮৫০-১৯০৯

হাম বড়া সাব

The merry Christmas is at hand
Sherry Champagne let us try
And how 'twill be a jolly land
When pegs begin to fly

Oh what a cheerful eve
Let us all the high way cry
And how happily we shall live
When pegs begin to fly.

হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট—
Mr. Mastfee name হামারা
চাট্‌গাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-to-tom-ti-tom & c.

গর কি মালেক আদ্‌মি কি মালেক
Lord of all hy-ham—
নেই সক্তা নিগর্স বাট্‌ মেরা tolerate
চুনাম গলি মেরা ধাম—
Rom-ti-tom-ti-tom & c.

Dirty Niggers I hate to see
বড়া ময়লা উঃ বাপ রে বাপ
Holway pills হাম কায়েঙ্গে রাট্‌কো
Health রাখ্‌নে মেরা সাফ্‌
Rom-ti-tom-ti-tom & c.

Coat পিনি Pantaloon পিনি, পিনি মোর trousers
Every two years new suits পিনি
Direct from Chandny Bazar—
Rom-ti-tom-ti-tom & c.

চিংড়ি fish and কাঁচা কেলা
The only Hazree once I [eat]
চারপাই is my palang posh,
Morah is my Royal [seat]
Rom-ti-tom-ti-tom & c.

Chorus—
I am a gentleman.

অমৃতলাল বসু

১৮৫৩-১৯২৯

শনিবারের বারবেলা

ঝি-রা ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো,
জল ফুরুলো কলে।
বাজিয়ে শাঁক ডাকায় নাক,
সাঁজের বাতি জ্বলে।।
বি এলে - বেলে পড়ছে ছেলে,
মাষ্টার বসে ঢোলে।
বিছিয়ে পাটি চায়ের বাটি
বউ-মা মুখে তোলে।।
শরীর কাঠি, গতর মাটি,
বসেন নাকো নড়ে।
কাটান বেলা বেগারঠেলা
পানের খিলি গড়ে।।
ঘরের গিন্নি মানেন শিন্নি
বৌয়ের বেটা হলে।
ফুলের কুঁড়ি ননদ ছুঁড়ি
রিষের বিষে জ্বলে।।
ফুরশি মেজে, গুড়ুক সেজে,
কর্তা গুড়ুক টানে।
আফিঙ খেয়ে, চেঁচিয়ে চেয়ে,
দেখেন আলো পানে।।
ময়লা বেশে গয়লা এসে
কড়ায় মাপে দুধ।
পাড়ার পূণে দে যায় গুণে
গেল মাসের সুদ।।

নকলদানা, গরম চানা,
হাঁকছে মিহি সুরে।
পইস্ পইস্— চেঁচায় সইস,
বাতাস লাগে নুরে।।
সাজিয়ে ডালা ফুলের মালা
বেচছে বসে মালী।
মেছোর মেয়ে খদ্দের পেয়ে
দিচ্ছে দেদার গালি।।
ছ্যাকড়া গাড়ি ডাকছে হাড়ী,
বিবির বাড়ি যাবে।
পাতায় মোড়া ফুলের তোড়া
টাটকা তাড়ি খাবে।।
মাতুল শুঁড়ি ফুলিয়ে ভুঁড়ি,
ভরছে পিপে জলে।
মাপছে দেশি বেচবে বেশি
দোকান বন্ধ হলে।।
বিশেষ কাবু আপিস্-বাবু,
চলছে এঁকে-বেঁকে।
ভোগ দে দাঁড়া ট্রামের ভাড়া
মামার বাড়ি রেখে।।
বিজ্‌লি ছুঁড়ি হয় না বুড়ি,
টানছে দেখ গাড়ি।
জ্বালছে আলো, ঘোরায় ভালো
পাঙ্খা বাড়ি বাড়ি।।
কতক কুঠি দুটোয় ছুটি,
কম কেরাণী পথে।
কেউ বা হেঁটে, হাত দে পেটে,
কেউ ভাড়াটে রথে।।
নাট্যশালায় আলো জ্বালায়,
টিকিট-ঘরে মেলা।

বাজবে ন-টা লাগবে ঘটা,
করবে শুরু খেলা।।
গর্ভ-বখাট মূর্খ আকাট
ব্যাদড়া ছেলেগুলো।
সয় না দেরি বাগিয়ে টেরি
খুঁজছে কোথা চুলো।।
মাড়োয়ারীরে জড়োয়া-হীরে
হাতে-গলায় পরে।
ফেটিং চড়ে ঘুরছে মোড়ে,
চোখ যেতেছে ক্ষরে।।
মই নে ছুটে গ্যাসের মুটে
চলছে আলো জ্বেলে।
দাঁড়িয়ে মোড়ে জুঁয়ের গোড়ে
হাঁকে মালীর ছেলে।।
মেঠাইওলা ঘিয়ের খোলা
চাপিয়ে দেছে আঁচে।
ড্রেনের গন্ধ নয়কো মন্দ
ঘৃতসিন্ধুর কাছে।।
দাঁড়ীর ফেরে তিন-পো মেরে
বেচবে লুচির পোয়া।
পাপ কাটাতে তাই পাটাতে
দিচ্ছে ধুনোর ধোঁয়া।।
পাহারাওলা লোকের চলা
ঠাউরে চোখে দেখে।
কার বগলে কালো বোতলে
মাল চলেছে ঢেকে।।
এগিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে
বলছে, মাতোয়ালা।
চুকাও দাবি, নেই তো আবি
থানায় চলো শালা।।

এ হে হে হে হ্যা,　　　　গ্যাল গ্যাল গ্যা,—
পড়ল মাগী চাপা
ট্রামের গাড়ি　　　　মারলে পাড়ি
বোগনো-ভাঙা লাফা।।
শনির সাঁজে　　　　শহর মাঝে
বারবেলাটা ফলে।
কেউ বা মরে,　　　　কাউকে ধরে,
কারুর মজা চলে।।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

১৮৫৪-১৯০৫

তালগাছ

মোহনবাঁশির মহাকবিতা

রে তালগাছ!
কেন এত লম্বা, যেন প্রেম-কাম্বা,
নাহি কিছু ঢম্বা তব।
দেখি এই আম্বা, ভীত জগদম্বা,
আকাশ স্পর্শম্বা হব।।

নাহি শাখা নাহি প্রশাখা নাহি সখা নাহি বিসখা,
সংসারে দেখি তোর সকলই ফাঁকা।
তোর দোয়ারে নাইক আকা, তোর মাথায় বসি কাক ডাকে কা-কা
যেন মূর্তিমান দুঃখের ছবি আঁকা।।

আমি শুনেছি পুরাণে
নারিকেল গাছ সনে,
আছে তোর মাখামাখি ভাব।
সেই তোর কে বা হয়,—
সহোদর ভাই নয়?
তোর তাল ভালো, কিংবা ভালো তার ডাব?

খর্জুর সুপারি,
দুই গাছ ভারি,
সম্বন্ধি কি ভায়রা-ভাই বুঝিবারে নারি।
রূপ মনোহারি,
যাই বলিহারি,
তাল গাছ কাছে কিন্তু উভয়েরই হারি।।

তাল !
তোর নাইকো মাতা, নাইকো পিতা, মাথায় দিবার নাইকো ছাতা,
নহিলে বর্ষায় এত ভিজিস কেন ?
তাল ! তোর ভাত খাইবার নাই কলাপাতা, পায়ে দিবার নাই বুটজুতা,
নহিলে তোর গোড়ালিতে এত কাদা কেন ?

তাল ! তোর জমা-খরচের নাইকো খাতা, শয়নের তোর নাইকো কাঁথা,
নহিলে দিন রাত এত দাঁড়ায়ে কেন ?
সত্য করে বল রে তাল, কেন তোর এই বদ্ হাল ?
চোরে কি লুটেছে তোর সব মালামাল ?

তোর তালশাঁসে কি নাইকো রস,
তাই তুই হয়েছিস এত বিরস,
আমি থাকতে দুঃখ কী রে ওরে কানাইলাল ।।

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮৫৫-১৯৩২

ও প্রাণ

ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল!
খুশির খুশি মহাখুশি সপত্নী-কোন্দল!
তুমি আমার ঘরকন্না উনকুটি চৌষট্টি,
ধান ভানতে ঢেঁকি তুমি, মাছ বানাতে বঁট্টি।
বেড়ির মুখে হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা,
মশলা পেষার শিল-নোড়া, কলাই পেষার জাঁতা।
হাতিশালের হাতি তুমি, ঘোড়াশালের ঘোড়া,
তিন ভুবনে কোথায় মেলে তোমার একটি জোড়া!
গোশালেতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু,
আর মন মজাতে তুমি প্রভু বংশীধারীর বেণু!
ভাঁড়ারঘরের ভরাভর্তি, শয়নঘরের বাতি,
ভাগ্যিবলে কভু মেলে পদগম্বুজের লাথি!
বিপদকালে তুমি আমার মহাবীর হনু,
দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে অদর্শনে মনু!

ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল!
ঈরিষা তিরিষা বারণ, আর বারণ প্রেমানল!
কাঁচা চুলে দড়ি তুমি, পাকা ধানে মই,
সাঁতলা ভাজায় তুমি আমার মুড়ি-মুড়কি খই!
ব্যান্নুনেতে লবণ তুমি, মাছের মুড়ো ঝোলে,
মোচার ঘণ্টে বড়ি তুমি, কাঁচা আম শোলে!
ভাপা দই তুমি সাফা, দুধের ক্ষীর-চাঁচি,
তোমা নইলে কেমন করে বল প্রাণে বাঁচি।

ঢোপাকুলে সলপ তুমি, অরুচির রুচি!
তোমায় পেলে নিমেষেতে নয়নের জল মুছি।

তুমি আমার

পান্তা ভাতে বেগুন পোড়া, ফ্যান্‌সা ভাতে ঘি,
কেমন করে বলব, বঁধু, তুমি আমার কী!
তুমি আমার জরি-জরাও, তুমি পাকা কোটা,
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর জলের ফোঁটা!
শীতের তুমি ওড়ন-পাড়ন, গ্রীষ্মে জলের জালা,
বসন্তে বাহার তুমি, বর্ষাকালে নালা!
এক মুখেতে করব তোমার গুণগান কত,
অভিমানে সোহাগ তুমি, বেশ-বিন্যাস যত!
তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ, পানে দোক্তা-চুন,
তোমায় এক দণ্ড নাহি পেলে একেবারে খুন!
যৌবন জোয়ার-জলে তুমি রূপের ঢেউ,
যতন কল্লেই রতন মেলে আমা বই
তোমায় পায় না কেউ!

তুমি আমার

সোনার রংয়ে জোড়া ভুরু, কালো জুলপি চুল;
খাসা নাকে ঢাসা নথ তাহে নলক দুল!
বাউটি তাবিজ রতন-চক্র তুমি সুগোল হাতে,
সিঁতি ঝুমকো কণ্ঠহার ধুক্‌ধুকিটি তাতে!
মলের তুমি রুনুঝুনু, চন্দ্রহারের খামি,
আমা-রূপী বোচকাবাহী, তোমায় নমি, স্বামি!

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১৮৫৫-১৯২০

গোলাপ

এবে গোলাপে গোলাপে ছাইয়া ফেলেছে
এ মধু কানন দেশ।
সখি তুমিও আইস, গোলাপি অধরে,
ধরিয়া গোলাপি বেশ!
বধূ, ছাদে ও আঁগনে, অলিগলি সব
গোলাপেতে ভরপুর!
আর প্রাণবাতায়নে ভাবগুলি সব
গোলাপি নেশায় চূর!
সখি, ফুলকবি আমি, থাকি চিরদিন
গোলাপের সুরপুরে
তাই গোলাপি গাথায় গাঁথি তব নাম
গাহিব গোলাপি সুরে।

ডায়মন্‌কাটা মল

সে দিন শ্বশুরবাড়ি গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি; এমন সময়ে, নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ির তিন বধূ ও বাড়ির কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, 'নাতজামাই, বুঝিব, তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি কোন্‌টি কে।' তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!
উঠিছে পড়িছে কি রে, নামিছে উঠিছে কি রে,
রূপ-হর্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?

ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে,   কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
        নিশুতির শান্ত গৃহে খুলিয়ে অর্গল ?
সুন্দরীর উচ্চ-হাসি,   পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
        অবিরল ছুটে কি রে আনন্দে চঞ্চল ?
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,   ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,
        কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল ?
মল বলে,— 'আমি যার   'বধূ' সে গো নহে আর,
        মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল !'
বড় বধূ ওই আসে,   শিশুরা পলায় ত্রাসে ;
        চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল !
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে ?   কোকিল কি ঝঙ্কারিছে ?
        মুখর বিরহ বলে, 'চল্ চল্ চল্'—
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল !

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল !
হল না রে ঘুরাইতে,   প্রেম-চাবি ছুঁতে ছুঁতে
        না ছুঁইতে বাজে কেন সোহাগের কল ?
ঝিল্লি সাথে নিশি বায়   ঝাঁপ্তালে গীত গায় ;
        নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল !
রাজহংস কী কহিল,   প্রাণ-কর্ণে কী গাহিল,
        লজ্জা গেল ;— দময়ন্তী তনু টল্মল্ !
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,   ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,
        তেমনি বধূর পায়ে বাজে ওই মল !
মল বলে,— 'আমি যার,   বধূ সে গো নহে আর
        ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল !'
'খোকার ঝিনুক কই ?'   মেজো বউ বলে ওই,
        অধরে গরল তার নয়নে অনল !

কুহু-কুহু কুহরিত, অলিপুঞ্জ-মুখরিত,
বধূর যৌবন-কুঞ্জ মরি কি শ্যামল!
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল!

৩

ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, বাজে ওই মল!
পদ্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশ দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কি রে হইয়ে পাগল?
অতনু কি মৃদু ভাষে, লুকায় উমার বাসে?
পাছে ভাঙ্গে তপ, জ্বলে হর-কোপানল!
কেন, কেন ম্রিয়মাণ, হেমন্তে পাখির প্রাণ
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল?
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, বাজে ওই মল!
মল বলে, 'আমি যার, চির-লজ্জা সখী তার;
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ হলাহল!
চুম্বিয়ে চরণ তার জাগাই গো বারবার;
বধূর কেমন পণ, সকলই বিফল!'
ঘোমটা টানি মাথায়, সেজো বউ চলি যায়;
পদ্ম-দলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল!
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, বাজে ওই মল!

৪

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্, বাজে ওই মল!
জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল!
শুনে শ্যামা নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল ছল আঁখি রাধা চাহে ধরাতল।
মিলন লজ্জার বুকে, মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে, 'হেতা হ'তে চল্ সখী চল্!'

প্রগল্‌ভা হাসিতে চায়; গুরুজন!— এ কি দায়।
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল!
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
মল বলে, 'বল্, ওরে সরে যেতে বল্';
কবি বলে, আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু ভরমে বিকল;
যামিনীতে দেখা হ'লে, সুধাব সোহাগ-ছলে,
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্বরী, সখি, তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায়? বল্ সখি বল্?
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
ওই বাজে মল।

লক্ষ্ণৌর আতা

চাহি না 'আনার'— যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর!
চাহি নাক 'সেউ'— যেন বিরহবিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন-রুচির!
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নববধূটির!
চাহি না 'গন্না'র স্বাদ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতির!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া,
চঞ্চলা বেগম কোনো হয়ে উল্লসিতা
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কী বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকার রসনা উপরি!

লক্ষ্ণৌ শহরে ইক্ষুকে 'গন্না' বলে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১৮৫৫-১৯১৮

মশা

বাগানে বাগানে ঘুরে, এ ফুলে ও ফুলে উড়ে
মধুর পিপাসী অলি মধুপান করিয়া,
নিশিতে ফুলের বুকে, লাগাইয়া মুখে মুখে,
বিবশে সে থাকে বটে মাতোয়ারা পড়িয়া!
শরতে যামিনী কালে, বেষ্টিত তারকাজালে
উঠিলে সোনার শশী মৃদু মৃদু হাসিয়া,
অনন্ত গগনতলে সুধা পিয়ে কুতূহলে
চঞ্চল চকোর ছোটে সে অনন্তে ভাসিয়া!
বরষার নব ঘন করি মৃদু গরজন
নীল রঙে নীলাকাশ ফেলে যবে ছাইয়া।
নব জল পিপাসায় আহ্লাদে চাতক ধায়
'দে জল দে জল' বলি মনসুখে গাইয়া!
কিন্তু হে রসিক মশা, কুসুমের কোলে বসা
সামান্য সুধাংশু অই অবহেলা করিয়া
ভ্রুক্ষেপে চাহ না ফিরে, চাহ না নীরদ নীরে,
বর্ষে যে জ্যোৎস্নাজল, ফুল পড়ে ঝ রিয়া!
তুমি করি প্রাণপণ, (লোকে বলে 'পণ্ পণ্')
বাড়ি বাড়ি কোণে কোণে সদা ফির ঘুরিয়া।
ফুলের অধিক শোভা, চাঁদ চেয়ে মনোলোভা
দেখিলে যুবতী-মুখ চুমো খাও উড়িয়া!
কিন্তু দুর্বিপাকে বটে কখনও মরণ ঘটে—
সুধা কে ছাড়িয়া থাকে সুদর্শনে ডরিয়া?
সুরেন্দ্র ইন্দ্রও চায়, সে আননে যদি পায়
একটি চুম্বন তার শতবার মরিয়া!

চুল শুকানো

ধুইয়া দিয়াছে চুল খৈল-গিলা দিয়া,
পেছন দুয়ারে বসি রউদে শুকায়,
পউষের 'নীলা নীলা' বাতাস আসিয়া
এলাইয়া মেলাইয়া পলাইয়া যায়!

হইয়ে বন্ধনমুক্ত পেয়ে স্বাধীনতা,
খেলা করে কেশরাশি হেন মনে লয়,
বন্দরের কারাবদ্ধ মেঘ উড়ে যথা,
শীতের শৃঙ্খল ছিঁড়ি বসন্ত সময়!

চোখে মুখে বুকে পিঠে মাখা কালো চুল,
যেন অমা-অন্ধকার রেখেছে ঢাকিয়া
অতি শুভ্র এক বনকুমুদের ফুল,
প্রতি কেশে প্রতি আশা-অভিলাষ দিয়া!

কিম্বা যে পথিক অই খাড়া আমতলা,
তারই কি চাহনি-নীলে ছাইল সরলা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১-১৯৪১

হিং টিং ছট্‌

স্বপ্নমঙ্গল

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়ে যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে,
'পাখি উড়ে গেছে' বলে মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে, 'কী আপদ!' কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখির মতন রাজা করে ছটফট,
বেদে কানে কানে বলে— 'হিং টিং ছট্‌।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-সাত
চোখে কারও নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।

ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ— এতই বিভ্রাট।
সারি সারি বসে গেছে কথা নাহি মুখে,
চিন্তা যত ভারী হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে— 'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

চারি দিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস
কালিদাস-কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যখেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।
চুপ করে বসে থাকে বিষম সংকট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে— 'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্ররাজ,
'ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিত-সমাজ,

তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।'
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশকপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়—
'সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্‌।'
সভাসুদ্ধ বলি উঠে— 'হিং টিং ছট্‌।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টকটকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
'ডেকে এনে পরিহাস' রেগেমেগে বলে।
ফরাসি পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে,
'স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট,
শুনিতে কী মিষ্ট আহা, হিং টিং ছট্‌।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক্ ধিক্—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক!
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক-বিকার,
এ-কথা কেমন করে করিব স্বীকার।
জগৎ-বিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!— দুপুরে ডাকাতি!
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
'গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক।
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।'
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্বার উচ্চারিল— 'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা-কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।

সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার,
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।'
সমস্বরে কহে সবে— 'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমাণ জীবাত্মাবিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

'সাধু সাধু সাধু' রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে— পরিষ্কার অতি পরিষ্কার।
দুর্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্ররাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ

পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহু দিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু-রাজ্য নড়িচড়ি উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল— হিং টিং ছট্।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।।

—

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে,
এ-কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ-কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলই মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

অনবসর

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী!
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি,
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে—
নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই—
হায় রে আমার হতভাগ্য!
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখতে দেখতে
ঝ'রে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ-ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু—
তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই

সেটা বড়োই বর্বরতা—
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

এসো আমার শ্রাবণ-নিশি,
এসো আমার শরৎলক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্তদিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এসো, তুমিও এসো,
তুমি এসো, এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
ধরণীর নাম মর্ত্যভূমি—
যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই, এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

ইচ্ছে করে বসে বসে
পদ্যে লিখি গৃহকোণায়
'তুমিই আছ জগৎ জুড়ে'—
সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়।
ইচ্ছে করে কোনোমতেই
সান্ত্বনা আর মানব না রে,
এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে—
চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই,
কখন তবে বিলাপ করি?
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

রঙ্গ

'এ তো বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন্-পাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত—
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।

ছড়া

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়-রা
সে বছর পুষেছিল এক পাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফে ঠোক্কর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধরে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়।
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।
'রানাঘাট সমাচারে' লিখেছে রিপোর্টার—
আঠারোই অঘ্রানে শুরু হতে ভোরটার
বেশি বৈ কম নয় ছয়-সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।
এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।
ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিসের গাফেলি;
পুলিস বলে যে, চলো বুঝেসুঝে পা ফেলি।
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এ-সব ফসল ফলে কন্‌গ্রেসি শস্যে।

সবজির বাজারেতে মুলো মোচা সস্তায়
পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।
ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা,
যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা।
'মহাকাল' লিখেছিল, ভাষা তার শানানো,
চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো—
বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু পক্ষে,
শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে।
দাঙ্গায় হাঙ্গামে মিছে ক'রে লোক গোনা,
সংবাদী সমাজের কখনও এ যোগ্য না।
আর-এক সাক্ষীর আর-এক জবানি—
বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে,
ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেবড়ে।
শুনে এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্য,
কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য—
জানি না কি ও পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল!
ভবানী লিখল, এ যে আগাগোড়া লাইবেল।
মাঝে থেকে গায়ে প'ড়ে চেঁচায় আদিত্য—
আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব!
কোন্ বংশে-যে মোর জন্ম তা জান তো,
আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত;
আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে।
এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
গো বটে, গোয়ালাবাসী, জানি তাহা আমি যে।
ঠাট্টার অর্থটা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হল, পরদিনে পারল সে বুঝতে।
মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
এখনই ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।

ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম,
কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম।
জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই
আদালতে কত করে পেয়েছিল সে রেহাই।
ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে
তার কথা বলি যদি— এই ব'লে বলাটা
শুরু করে ঘেঁটে দিল পঙ্কের তলাটা।
তার পরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই,
মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই।
মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।
আসল কথাটা এই অটলা ও পটলা
বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা।
শুধু কুলি চার জন করেছিল গোলমাল,
লাল-পাগড়ি সে এসে বলেছিল 'তোল্ মাল'।
গুড়ের কল্‌সিখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
রাজ্যের খেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল;
বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার—
দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার।
সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী,
গ্রামের নিন্দে সে যে সইতেই পারে নি।
নেহাত পারে না যারা পাবলিশ না ক'রে
সব-শেষ পাতে দিল বর্জই আখরে।
প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়।
ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সজনী—
সহ্য না হল সেটা, শুনেছে বা ক'জনই।
জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে।

আদরের ভাগনের কী কেলেঙ্কারি সে,
বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।
হিতসাধিনী সভার চাঁদা-চুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দু-ভাগ হল মাগুরার কলেজে—
এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে।
চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
তারা লাগে দু-দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।
দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,
তার পরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার।
ভয়ে ভয়ে ছি ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।
একদা দু এডিটরে দেখা হল গাড়িতে,
পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে।
ফোঁস ক'রে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই,
ঝাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই।
একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্যে,
দুজনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে।
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।
পয়লা দলের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable—
এইমতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা।
অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ—
কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ-ভেউ।
হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রঙ্গ—
গার্ড্ এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ।
গার্ড্‌কে সেলাম করি, বলি— ভাই, বাঁচালি,
টার্মিনাসেতে এল বেল-ছোঁড়া পাঁচালি।

ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হেলে দুলে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

১৮৬১-১৯০৭

ভাবের সঙ্গীত

কলিতে বৈরাগী দাদা,
আচ্ছা মজা লুটে নিলে।
তুমি চৈতন্যেরে প্রাণে মেরে
বুদ্ধের উপর টেক্কা দিলে।।
মানুষ বানর গাছ পাথর হয়
আরব দেশের গল্পে বলে।
তুমি ইণ্ডিয়াতে মাল্লে বাজী
জিতে গেলে ভেলকী খেলে।।
মরেছে রামমোহন, ও তার
পিণ্ড দাও গে তুলসী তিলে;
এখন পূর্ণব্রহ্ম কল্‌কেতাতে,
জয় বল তার সবাই মিলে।।
উনবিংশ শতাব্দীতে
জ্ঞানের আলো পায় সকলে;
তুমি সবার চোকে দিচ্চো ধুলো,
এ কি তোমার নূতন লীলে।।
প্রতিমূর্তি ছিল যত
ফেলে দিলে মিথ্যা বলে।
শেষে বৃক্ষ নদী পার পেলে না,
নিজেই এবার দেবতা হলে।।
তুলসী বনে বাগের কথা
শুনেছিলেম প্রবাদ বলে।
ও তা এতদিনে দেখতে পেলাম্‌
তুমিই আমায় দেখিয়ে দিলে।।

তোমার ঘড়ী, নস্যদানী
আলবার্ট চেনের মালা গলে।
যত, দেড়ে চেলার আজব খেলা
পদ্মকুঁড়েয় বদরতলে।।
চোকে ঠুলি সরল বুলি
মাথায় টেরী টিকির ছলে।
দাদা শ্রীপাট তোমার, ফুলের বাগান,
চণ্ডী পড় গোলেমালে।।
অঙ্গ বিঁধে জপ কর তাই
পবনরূপী শক্তিশেলে।
তোমার আপন কীর্তি ইষ্টমন্ত্র
তুমি নাচ নিজের মনের তালে।।
যিহোবা, জোভ, যীশুখৃষ্ট
আল্লা কৃষ্ণ দেব সকলে।
বুঝি সবার অংশে তোমার জন্ম।
এলেম শিখে জাহির হয়ে।।
তোমার কার্দানি আর কেরামতে
রাজা উজীর ঘুরিয়ে ফেলে।
ঐ সে আমীর ওমরা পড়চে ঘুরে,
মেয়ের জোর সার কলিকালে।।
ছেলের চেয়ে মেয়ের বাজার
গরম হল ধরাতলে।
দাদা, বাদ্‌সা কাজি মেয়ের গোলাম
নবাব ত তার নখের তলে।।
বক্তৃতাতে হল্ ফাটানো,
গাল টাটানো কথা বলে।
দাদা, এবার শিখে লব, যা হয় হবে
বক্তা হব এবার মলে।।
মরে যদি জন্ম থাকে
জন্মাব তোমাদের কুলে।

তখন ত্রিকালজ্ঞ আমি কিনা
জানিয়ে দিব ধ্বজা তুলে।
বেঙ্গল এখন কেনান হল
হাসি পায় তা মনে এলে
দাদা, কল্‌কেতা তার যেরুশালম
মন্দির ও তার পবলিক হলে।।
নেটিভ ক্রাইষ্ট তুমিই এখন
সেভিয়ার হয়েছ হালে।
দাদা, কেনানের মেষশিশুর মতো
ঠাট্টাক্রুশে প্রাণ হারালে।।
ভবেতে যার লেগেছে ঢেউ
যাবে তোমার পায়ের তলে;
তখন দেখো দাদা রাগ কোরো না,
দিয়ো তারে পায়ে ঠেলে।
তুমি, আগে শিষ্য পরে ছাত্র
অবশেষে গুরু হলে।
দাদা, হয়ে দৈবজ্ঞ আর আদেশধারী
অহংব্রহ্ম সার করিলে।।
ভবনদীর পারে ও ভাই
কে যেতে চাও এসো চলে।
এ যে দাদার আমার চরণতরি
বাতাস বচ্চে আদেশ পালে।।
সাম্‌লে এবার দাঁড় টেনো ভাই
পাণি যেন ঠেকে হালে।
দাদা, নিজে হয়ে সপ্ত মাঝি
শেষে সমাজদহে নাম ডুবালে।।
এই কি তোমার ক্ষমা করা
ছল ছাড় না কসুর পেলে।
এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল
মাত হয়েছে রাজার ছেলে।।

হাতে করে রসগোল্লা
ভোলাতে চাও কচি ছেলে।।
এখন জহর কাঁচে সবাই বাচে
রঙ্গে নাচে মূর্খদলে।।
শফরী শিশুদের মতো
লাফাও দাদা অল্প জলে।
এদের বোঝাতে সে বুদ্ধি লাগে
মাছ ভাজা নয় মাছের তেলে।।
পরে রে কি দিবে বুদ্ধি
চিত্তশুদ্ধি সবার মূলে?
করে আসলে ভুল পাকালে চুল
জড়িয়ে বেড়াও নিজের ভুলে।।
ঈশ্বর হওয়া মুখের কথা
হাতী মারা মশার হুলে।
দাদা, রাং কি কভু হয় গো সোনা
থুথুতে কি ছাতু গলে।।
সত্যতত্ত্ব সার করো ভাই
আদেশ রাখো শিকেয় তুলে।
তখন, দৈবজ্ঞ হয় অনভিজ্ঞ,
পড়ে যখন যমের জালে।।
এখন দাদা সামলে চলো,
কে ভুলবে আর কথার ছলে।
ও তাই ফকিরচাঁদ বাবাজী বলে
ধর্মের মর্ম কর্মফলে।।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৮৬১-১৯৪২

ছিটেফোঁটা

১

পায়ের শত্রু ট্রামের গাড়ি, পেটের শত্রু জাঁক,
মাথার শত্রু এড়ো তর্ক, কানের শত্রু ঢাক।
চোখের শত্রু সস্তা ছবি, নাকের— ধুলা বালি,
হাসির শত্রু জেদের গোঁ, কথার শত্রু গালি।
রূপের শত্রু অসংযম, গুণের শত্রু স্তুতি,
সত্যের শত্রু স্বরাজ সাধন, প্রেমের শত্রু দূতী।
ধর্মের শত্রু গুরুর বচন, কর্মের শত্রু ভান,
নারীর শত্রু অলঙ্কার, নরের শত্রু মান।
শিশুর শত্রু নীতিশিক্ষা, যুবার— শাসন কড়া,
গৃহীর শত্রু টাকা ধার, বুড়ার— গীতা পড়া।
শুচির শত্রু দাস দাসী, রুচির শত্রু খানা,
কান্তির শত্রু সাবাং মাখা, শান্তির 'বন্ধু' থানা।

২

পাত্র না হয় হলই লা১, গুণ নাই কি কনেরও?
এত টাকা ৫০? সীমা নাই কি ১৫?
২এ নেবে আমার সিন্দুক? দেবে নাকো রেহাই সে?
আমায় কিনা ৮কে ফাঁদে হবে আমার বেয়াই সে?

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৩-১৯৪৯

কাশীর কিঞ্চিৎ

বৈকালেতে মজলিশটা জমে গঙ্গাতীরে,
কেদারঘাটে, কিম্বা বসি শীতলা-মন্দিরে;
কোন্ স্যাকরা কেমন, কত নতুন গুড়ের দর,
পোড়ারমুখো ধোপা ছিঁড়ে দেছে নেপের অড়;
সোনারপুরের সাধুটিকে এলেম আজ দেখে—
শরীরের তাঁর ছায়া নেই, থাকেন মুখ ঢেকে,
কী বা ভুরু, কী বা নাক, কী বা তাঁর চোক,
আকাশেতে উড়তে তাঁরে দেখেচে কত লোক;
দেখেচে ডুব দিতে তাঁরে নেড়ির মা নিজে,
কী আশ্চর্য— কোপ্‌নিটেও যায় নি জলে ভিজে!
মেচুনি হারামজাদী তার ভালোর মাথা খাবে—
তিন আনা সের নিলে মাগী,— অধঃপাতে যাবে!
ছেলেকে পর করলে আমার সর্বনাশী আসি।
কী বলিস লো, তা না তো আজ কে আসত কাশী?
'মা' বলতে অজ্ঞান মোর হত বাছা আগে,
পাঁচ টাকা পাঠাতে আজ হাতে আগুন লাগে!
— ইত্যাদি সব ধর্মচর্চা চলে সে আসরে।
হাতে কিন্তু জপের মালা অবিশ্রান্ত ঘোরে।

গল্প লেখার আদর্শ

স্থান

হবে সেটা দার্জিলিং কি পুরী— কিম্বা ওয়ালটেয়ার
থাকাটা চাই— সমুদ্র কি ঝরণা, অন্তত পাহাড়;
বাড়িটে হবে অট্টালিকা— পুষ্পিত নবলতিকা—
বারাণ্ডাতে মারবে উঁকি,— মাধবী সব রইবে ঝুঁকি
'ক্রিসেনথিমাম' ফুট্‌বে টবে,— রইবে লিলির বাহার
শেফালী আর শিশির থাক্‌বে,
তা, যে ঋতুই হোক্ যাহার।

কাল

হবে সেটা বসন্ত— অর্থাৎ ফাল্গুন কি চৈত্র মাস
মৃদু মৃদু মিঠে মিঠে বইবে (ও) মলয় বাতাস,
কোকিল, অন্তত পাপিয়া— ঘন ঘন ডাকিয়া—
নায়ক ও নায়িকার দরকার বুঝে
দুপুর রাত্তিরে সহকার খুঁজে,
বাড়িয়ে দেবে আনন্দ বা হাহুতাশ;
তাঁদেরও আলবৎ ফেলাটা চাই দীর্ঘশ্বাস।

পাত্রী

জননী, তাঁর মেয়ে (অবশ্য ষোড়শী), আর তাঁর পিতা
এ কথাটা নাই বা বল্লুম্ যে মেয়েটি অপরিণীতা;
হবেন তিনি উর্বশী কি রম্ভা, চুল হবে রেশ্‌মী ও লম্বা;
অবশ্য কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ,
চক্ষু আকর্ণ, রংটা বিগলিত স্বর্ণ;

এবং নিশ্চয়ই হতে হবে তাঁকে খুবই উচ্চশিক্ষিতা—
ইংরাজিতে, আর সঙ্গীতে নৃত্যে ও পিওনোতে সুদীক্ষিতা।

প্রবেশ

পরীক্ষান্তে আসবে সেথা পরেশ কি বিনয়, বি.এ.টা দিয়া—
পরিবর্তন হেতু, কারণ ধরেচে দুষ্ট ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।
খুড়ো কি জ্যাঠা সেথা প্লীডার— এটা করে রাখা চাই ধাতার।
আলাপ হবে যখন ভ্রমণ,— পরে চা পানের নিমন্ত্রণ,
শেষে বিনয়ের প্রবেশ ও যাতায়াত, ক্রমে চঞ্চল হিয়া,
এবং কথায় কথায় ওঠা চাই—
(একজন খুব কালো হলেও, যদিও তা হতে নেই)
—পরস্পরের মুখানি রাঙিয়া।

আসবাব

ঘরটায় থাকা চাই টেবিল চেয়ার সোফা ও পিওনো,—
উপন্যাস ও কবিতা, যাতে আছে প্রেমের কথা জিওনো,
মাথা ছাড়ার সরঞ্জাম, উৎকৃষ্ট কাগজ আর খাম,
এলবম আর ফুলদানী এবং বিনয়ের ফটোখানি;
দারিদ্র্য বা কষ্ট এসব সেথায় থাকতে পারে না কোনো
থাকবে কেবল গীত বাদ্য হাস্য,—পাছে—না লাগে মিওনো।
তারপরেতে, জ্যোৎস্না আর প্রভাত অরুণের আলো,—
(রবি চন্দ্রে বলাটা থাকবে, নায়িকার মুখেতে ঢালো)
গবাক্ষ দে' ঢুকে তারা— বিনয়ের কাছে সে চেহারা—
করে তুলবে হৃদয়স্পর্শী— যেন বোয়াল-ধরা বর্শী;
বেসেই ছিল, আরও বিনয় বেসে ফেলবে ভালো,
ক্রমে পত্রাঘাতে সেটা দাঁড়িয়ে যাবে নিবিড় এবং ঘোরালো।

জোটনা

হোক না কেন (উভয় মধ্যে) একজন ধোপা কি তাঁতি আর একজন রায়
খাঁটি পবিত্র প্রণয় না চেয়েছে, না কারুর মুখ চায়।

অতঃপর, মুহুর্মুহু,—আদমরা করবে কুহু কুহু,
ভুলে, জুতোটা দিয়ে হাতে— পা ঢোকাতে যাবে দস্তানাতে;
এমন সময়, রেগে নায়িকা হয়ে গেলেও ঢোল্-কানা,
ত্যাজ্যপুত্র হয়ে বিনয়—তারই গলায় (দেবেই) দেবে মালা।

উপসংহার

এই হবে গল্প লেখার আদর্শ, এবং বিবাহেরও!
তা যদি পার ত' ভালোই— না হয় ওপথ থেকে ফেরো।
অস্বাভাবিক ও অকস্মাৎ— যেমন চোখের তারায় বজ্রাঘাত
অর্থাৎ অঘটন ঘোটলে তবে প্লটের খোলতাই হবে।
কিম্বা, বিদেশী মাল রং বদলে— তরজমাতেই সেরো,
আর যদি সুসাহিত্য লিখতে যাও তো— সেটা তোমার গেরো।

সার

বিষয়টা হবে খাঁটি জ্যাঠামী,— আর যে অপরার্ধ
সেটা হবে ভাষার ভেল্কি, কথার কাঁড়ি, আর সাহিত্যের শ্রাদ্ধ।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

১৮৬৩-১৯২৭

নসীব

পেটের জ্বালা হয়ে নসীব করলে দেশছাড়া,
বনের ধারে খেতে দিলে পুঁইশাকের খাড়া।
বাঘ হয়ে সে হুমকি দিলে, দিলুম টেনে ছুট,
ডাকাত সেজে করলে নসীব যা ছিল সব লুট।
ঘুরিয়ে দেশ আনলে শেষ রাজার বাগানে,
দেখলে চেয়ে রাজকুমারী কৃপা-নয়ানে।
মাথায় তুলে নসীব দিলে রাজার আসন দান,
চক্ষু মেলে দেখি আমি নবাব খাঞ্জা খান।
গাও নসীবের জয়, গাও নসীবের জয়,
যা করা সব নসীব করে, তুমি আমি কিছু নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩-১৯১৩

যায় যায় যায়

ঐ যায় যায় যায়,—

প'ড়ে এ কলির ফেরে, সবাই যে রে— ভেঙ্গে চুরে ভেসে যায়।
ঐ যায়— ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথও চিৎ;
ঐ যায়— দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে যায় রে 'মিথ্'
ঐ যায়— রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র; দিবারাত্র টানাটানি, তাঁরেও শেষে
ঐ যায়— ৮৪ নরক, সপ্ত স্বরগ— তার সঙ্গে মিশি;
ঐ যায়— ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, ব্যাস, নারদ ঋষি;—
ঐ যায়— গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্যামের বাঁশরীটি; —
রৈল শুধু— আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায়— পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র, শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে;
ঐ যায়— গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম উড়ে;
রৈল শুধু— গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল, আর— ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়া';
রৈল শুধু—ভার্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

হতে পার্ত্তাম

রাজা। দেখ, হতে পার্ত্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ;
তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম আমি চটে-মটেই তো —

তা নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।
রাজা। দেখ, হতে পার্ত্তাম আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিদ—
কিন্তু 'গবেষণা' শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হয়ে রৈলাম আমি চটে-মটেই তো—
তা নইলে বেশ এক বড়ো—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো!
রাজা দেখ, হতে পার্ত্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গর্‌মিল হয় যে সবই,
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয় নাক সে সাড়া;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া;
তাই নীরব কবি হয়ে রৈলাম আমি চটে-মটেই তো,—
তা নইলে খুব একটা উঁচু—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।
রাজা। দেখ, হতে পার্ত্তাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মতো
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাবগুলি হে;
তা হাজার কাসি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চটে-মটেই তো;—
তা নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।
রাজা। দেখ, ক্ষমতাটা ছিল নাক সামান্য বিশেষ;

কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চ'লে যেতাম বেশ,
হতাম পেলে সুযোগও বুঝি একটা যেও সেও
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে নাক কেহ;
তা নইলে— বুঝ্‌লে কি না,—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।

যেমনিটি চাই তেমন হয় না

দেখ গাঁজাখুরী এই ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা বিশ্বময়— না?
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর যখন চাই বৃষ্টি— তা হয় না।

আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামী পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতকৃতার্থ;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা,
অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না;
চাই বেশির ভাগ পুত্র ও অল্পর ভাগ কন্যা;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্থা-কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় সস্তা;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই চির যৌবন, আমার কেমন বাত্তিক!
তা যৌবনটি বাঁধা তো রয় না;
চাই ধনে হই কুবের, আর রূপে হই কার্ত্তিক;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম,
চাই ভার্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর চাই নাক দুঃখ;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার গুণকীর্ত্তন গায় বিশ্বশুদ্ধ;—
যেন শিখানো টিয়া কি ময়না;
চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ,
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই রেলে সাহেবগণ হন আরো শিষ্ট,
আপিসে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিষ— কিন্তু হা অদৃষ্ট!—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

বাঙ্গালি-মহিমা

মিথ্যা মিথ্যা কথা যে,— 'বাঙ্গালি ভীরু, বাঙ্গালির নাহি একতা—'
কেন বক্তৃতায় রটাও সে বাণী, খবর কাগজে লেখ তা?
অদ্য পদ্যে আমি বাঙ্গালি-বীরত্ব করিব জগতে ঘোষণা;
বেরোবে ছাপায়; পড়িতে পাবে তা; ব্যস্ত হও কেন? রোসো না।
তবে তালুদেশে চড়াৎ করিয়া নেমে এস মাতা ভারতি!
অর্জুনের সাধ্য হ'ত যুদ্ধ করা কৃষ্ণ না থাকিলে সারথি?
সাহায্য তুমি না কর যদি আমি সমর্থ তাহাতে নহি মা;—
দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার, গাইব বাঙ্গালি-মহিমা।
খোলো ইতিহাস;— সতর তুরস্ক প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষ্মণ সেন তো দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক দীর্ঘপলায়নকাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজও ভালো করে কেহ গাহি নি!

পরে আফগান, মোগল, পাঠান দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব; তাহাও বীরত্বে সহিল বাঙ্গালি উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ; বাঙ্গালি (লেখে তো সব ইতিহাস-বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে পাঠানের ক্রোড় হইতে।
করেছে সংগ্রাম মহারাট্টা শিখ, মূর্খ যত সব মেড়ুয়া;
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মতো (যদিও পর নি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে বুঝে নিলে সব পলকে; —
'ভবিতব্য লিপি কে খণ্ডাতে পারে? কাটাকাটি ক'রে ফল কি?'
হবে না বা কেন? খায় ছাতু রুটি — পশ্চিমে পাঞ্জাবী পাহাড়ে;
তোমরা বসিয়া কাঁচকলা-ভাত খাও আধ্যাত্মিক আহারে।
তারা ভাবে তাই অলসতা চেয়ে কার্য করাটাই শ্রেয়সী;
তোমরা হাসিয়া ভাব মূর্খ সব — জীবনের সার প্রেয়সী;
তাহাদের চিত্র অর্জুন রাবণ ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে;
তোমাদের পট বংশীধর বাঁকা — প্রেমে ঢুলুঢুলু নয়নে;
তারা গায় সবে 'জয় সীতারাম' আজও শুনি যেথা যাই গো;
তোমাদের গান 'জয় শ্রীরাধিকে — ওগো দুটি ভিক্ষে পাই গো।'
তেমনটি কেহ পারে নি জগতে — তোমরা যেমন দেখালে;
বুঝেছে তা মোক্ষমূলার ও গেটে — ধিক্ মিথ্যাবাদী 'মেকালে'।
এ সব তো মাতা পুরাণ কাহিনী — কাঁহাতক রাখি স্মরি' মা।
কিন্তু আজও দেখ চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ বাঙ্গালি-গরিমা।
এখনও বাঙ্গালি জগৎসম্মুখে রাস্তাঘাটে দিয়া নিয়ত
চলিছে নির্ভয়ে — এ কথা জগতে প্রচার করিয়া দিয়ো তো।
তার পর বুদ্ধি! — আশ্চর্য সে বুদ্ধি! ইংরাজী ফরাসী কেতাবে
পড়িছে, পরীক্ষা দিতেছে; নিতেছে 'এমে' ও 'এমডি' খেতাবে।
ব্যবসা চাকরি করিয়া, — কত কি নাটক নভেল লিখিয়া,
আজিও আছে তো শুদ্ধ বুদ্ধিবলে এ জগতে সবে টিকিয়া।
ল্যাণ্ডোয় চড়িছে ফিটনে চড়িছে; — ট্যাণ্ডেম হাঁকায় সঘনে;
বা-সিকিলে যায়; অশ্বপৃষ্ঠে ধায় ধূলি উড়াইয়া গগনে;
খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে সার্কাস, জান না তাও কি?

করিছে বক্তৃতা — লিখিছে কাগজে; তার বেশি আর চাও কি!
ভেবে দেখ সেই সত্যযুগ হতে কলিযুগাবধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে তো; তার বেশি আর পার্বে কেন সে?
এত বিপদের আবর্তের মাঝে, এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টিকে আছে তো, তাকিয়া ঠেসিয়া, ফরাস আসনে।
ধন্য বুদ্ধিবল! — যুদ্ধে কভু শির দেও নি কাহারে বন্ধকী;
যদি বাহুবল অভাব, বুদ্ধিতে পুষিয়ে নিয়েছ। মন্দ কি!

সুখমৃত্যু

আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো,
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি;
চাকরির জন্য যেন আমার নিকটে গো,
কেহ নাহি করে উমেদারি;
পাচক ব্রাহ্মণ যেন ঝঙ্কার না করে গো,
উচ্চকণ্ঠে হুহুঙ্কার রোলে;
শুনিতে না হয় যেন কলহ করিয়া গো,
মানভরে, ঝি গিয়াছে চলে;
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিয়ো গো,
বরফশীতল দিয়ো বারি;
মশা যদি হয়, তবে খাটাইয়া দিয়ো গো,
শ্যামবর্ণ নেটের মশারি;
লেপি চারু 'মাথাঘষা' কবরীকুন্তলে গো,
কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া;
একটি পেয়ালা পাই সুবর্ণসুরভি গো,
চা খাইতে, দুগ্ধ চিনি দিয়া;
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো,
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো,
কেহ নাহি করে অনুরোধ!

রজনীকান্ত সেন

১৮৬৫-১৯১০

কিছু হল না

আমি পার হতে চাই, ওরা আমায় দেয় না পারের কড়ি;
আমি বলি লিখব, ওরা দেয় না হাতে খড়ি;
কিছু হল না।
ওরা খায় ক্ষীরনবনী, আমি বল্‌কা দুধ,
আমি করি তেজারতি, ওরা খায় সুদ;
কিছু হল না।
আমার গাছে ফল ধরে, ওরা সবই খায় পেড়ে,
আমি একটি হাতে কল্লেই, এসে নিয়ে যায় কেড়ে;
কিছু হল না।
আমি আনি বাজার করে, ওরা খায় রেঁধে,
ওরা করে রঙ-তামাসা, আমি মরি কেঁদে;
কিছু হল না।
আমি নৌকা বাঁধি, ওরা বাহার দিয়ে চড়ে,
আমি করি কড়ার হিসাব, ওরা ধরে গড়ে;
কিছু হল না।
হরি ভজব বলে নয়ন মুদি, ওরা সবাই হাসে,
আমি চাই নিরালা, ওরা কাছে বসে কাসে;
কিছু হল না।
আমি যদি প্রদীপ জ্বালি, ওরা মারে ফুঁ,
আমার যাতে 'না-না', ওদের তাতে 'হুঁ';
কিছু হল না।
আমি আনি মাছ-মাংস, ওরা মারে ছোঁ,
আমি বলি বুঝে দেখ, ওরা ধরে গোঁ;
কিছু হল না।

আমি করি ফুলের বাগান, ওরা তোলে ফুল,
আমি কিনি পাকা সোনা, ওরা পরে দুল;
কিছু হল না।
আমি বলি 'সময় গেল', ওরা বলে 'আছে',
আমি কাপড় কিনে দিই, ওরা ন্যাংটো হয়ে নাচে।
কিছু হল না।
আমি বলি 'বাপু' 'সোনা', ওরা মারে চড়,
আমি চাই ঝির্ঝিরে বাতাস, ওরা বহায় ঝড়।
কিছু হল না।
আমার যাত্রার সময় ওরা ধোবা নাপিত ডাকে,
আমি কানাকড়ি দাম বলি, ওরা লক্ষ টাকা হাঁকে;
কিছু হল না।
তোমরা দশঠাকুরে মিলে আমার কর একটা সালিশ;
কোন্ হুজুরের জুরিস্‌ডিকশন্, কোথায় করব নালিশ;
কিছু বুঝি নে!
'কম্‌পেনসেশন্' 'চিটিং' কিংবা, হবে স্বত্বের মামলা;
কোন্ আইনে কী বলে, ভাই, বড়ো বড়ো সামলা!
আমায় বলে দাও!
কত বারো বৎসর গেল, হল বুঝি তামাদি,
কান্ত বলে বিচার হবে, হলে পরে সমাধি;
কিছু ভেব না।

মৌতাত

হরি বল্ রে মন আমার
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার!

এমন বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে?
এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চশমা ধরেছে;

আর, টেরি নইলে চুলের গোড়ায় যায় না মলয় হাওয়া,
আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন হয় না জাদুর খাওয়া।
হরি বল্ রে...

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই;
সাহেবের ঘুষি ভিন্ন বিফল নাসা— চাকরি ভিন্ন প্রাণ;
উপহারশূন্য সাপ্তাহিক, আর প্রচারশূন্য দান।
হরি বল্ রে...

একটু চুটকি ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ
ফুটবল ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্ট সহ;
গজ-টেক— কালো ফিতে নৈলে— পায় না পোড়ার চোখে কান্না:
একটু পলাণ্ডুর সদ্‌গন্ধ ভিন্ন— হয় না মাংস রান্না।
হরি বল্ রে...

মাসিকপত্র আর কাটে না ছোটোগল্প ছাড়া
আর, সাপ্তাহিকটে ভালো চলে গাল দিলে বেয়াড়া;
একটু সাহেব-ঘেঁষা না হলে আর হয় না পদোন্নতি;
সত্যাসত্য দেখলে এখন চলে না ওকালতি।
হরি বল্ রে...

আদালতের কার্যে কেবল আমলাদের দাও খোসা;
আর, ভালো কাপড় গয়না ভিন্ন যায় না গিন্নির গোঁসা;
একবার বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোচে না গোজন্ম,
আর গিন্নির ঝাঁটা নইলে শক্ত হয় না পৃষ্ঠের চর্ম।
হরি বল্ রে...

একটু এটা-ওটা-সেটা ছাড়া জমে না যে মজা,
একটি সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণ ভজা;

নাটক দেখতে নিষেধ করলেই বাপটা হয়ে যান বদ্;
এখন জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাটকা chicken broth।
হরি বল্ রে...

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ঔষধ কাটে কার?
আর 'অ্যাণ্ড কোম্পানি' নাম না দিলে দোকান চলাই ভার;
এখন ফল ফুল অলি চাঁদ ভিন্ন হয় না পদ্য;
দেখ, কোনো ব্যাপারে যশ পাবে না বিনে একটু মদ্য।
হরি বল্ রে ...

ভালো হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা,
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু গোরু পাবেন কোথা?
আর, গৌর-অবতারে গোসাঞী কিসে ছাইবেন খোল?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল!
হরি বল্ রে...

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

১৮৬৭-১৯৩৭

তখন আর এখন

তখন যদি দেখতে আমায়, উঠতে ভয়ে ঘেমে
শুনলে 'হাঁকার' ভূমিকম্পের কম্প যেত থেমে;
সে দিন আর নাইকো রে ভাই,
সে দিন আর নাই—
দশজনারে দেখছ যেমন, আমিও এখন তাই।

মনে পড়ে রাজবাড়িতে হলে প্রয়োজন,
বাঘের দুধ দুইয়ে দিতাম আশি হাজার মণ;
সে দিন আর নাইকো রে ভাই,
সে দিন আর নাই—
ভাবতে গেলে সে সব কথা, বড়োই ব্যথা পাই।

মনে পড়ে, দুইটি বেলা দাঁড়িয়ে বাড়ির কাছে,
খড়্কে-কাঠির কাজ সেরেছি আস্ত তালের গাছে;
সে দিন আর নাইকো রে ভাই,
সে দিন আর নাই—
তালের গাছে খড়্কে খোঁটার দিন গিয়েছে ভাই।

হাতি নিয়ে লোফালুফি ছিল আমার কাজ,
সবাই আমায় ডাকত তখন 'কুস্তি-মহারাজ'।
সে দিন আর নাইকো রে ভাই,
সে দিন আর নাই—
তিনটি হাতির ভারেই এখন হাঁপিয়ে মারা যাই।

প্রমথ চৌধুরী

১৮৬৮-১৯৪৬

ব্যর্থ জীবন

মুখস্থে প্রথম কভু হই নি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙে নি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখি নি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবি নি বিলাসে।।

চাটুপটু বক্তা নহি, বড়ো এজ্‌লাসে।
উদ্ধার করি নি দেশ, টানিয়া চরসে।
পুত্রকন্যা হয় নাই বরষে বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে!

পয়সা করি নি আমি, পাই নি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব।।

অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে!

দোপাটি

১

অদর্শনে প্রেম যায়, অতি দরশনে,
পরের কথায়, কিম্বা শুধু অকারণে।

২

সতৃষ্ণ নয়নে শুধু হেরেছি তোমায়।
স্বপনে করিলে পান তৃষ্ণা নাহি যায়।

রসময় লাহা

১৮৬৯-১৯২৯

অনুতাপ

বড়ো গুরুতর বেজেছে হৃদয়ে, হায় কী করিনু পাপ!
প্রভু, সান্ত্বনা কিছুতে পাই না যত করি অনুতাপ।
কেবলই হে প্রভু, যাতনার ভরে বহিছে দীর্ঘশ্বাস;
সারারাত ধরে ঘুম নাই চোখে করিয়াছি হা হুতাশ!
অভাবের তরে নহে প্রভু নহে, সচ্ছল জমিদারী;
সখারাও মোরে বড়ো স্নেহ করে, হয়েছি উপাধিধারী।
পরিজন যত সদা অনুগত সুখী অতি মোর সুখে;
কিন্তু আজি হায়, প্রভু জ্বলে যায় উঃ! কী যন্ত্রণা বুকে।
প্রেমিকার তরে নহে এ বিরহ, নহে তার অভিমান;
শত উপাসক ছেড়ে সে আমারে করেছে হৃদয় দান।
শত্রু? আমার কেহ নাই প্রভু, তোমারই করুণাবলে;
অপরের সুখে করি না ঈর্ষ্যা, তথাপি বুক যে জ্বলে!
কেন পাইতেছি আজি এ যাতনা প্রভু, কী বলিব আহা!
খেয়েছিনু কাল আস্ত কাঁটাল— হজম হয় নি তাহা।

নারী-স্তোত্র

এই কবিতাটি চিরকুমারদিগের পাঠ্য। বিবাহিত পাঠক, দোহাই তোমার! তুমি যদি পড়ো তবে ইহার প্রতি শ্লোকের তৃতীয় চরণটি দ্বিতীয়ের স্থানে পড়িয়া অর্ধাঙ্গিনীকে শুনাইয়ো— নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা।

১

তিনিই পরম সুখী আপন জীবনে
ঘটে নি অদৃষ্টে যাঁর কভু পরিণয়

সংসারে চলেন যিনি জায়ার বচনে
নিদারুণ কষ্ট পান তিনি নিঃসংশয়।

২

মানব প্রকৃত শান্তি পায় না কখন
পরিণয় করি যবে লভে সে সঙ্গিনী;
যদবধি নাহি হেরে প্রিয়ার আনন,
তদবধি সুখে যাপে জীবন আপনি।

৩

অবলার হৃদিমাঝে সদা করে বাস,—
কপটতা, প্রবঞ্চনা, বৃথা অভিমান;
অমায়িক সরলতা সত্য ও বিশ্বাস
বনিতা-হৃদয়ে কভু নাহি পায় স্থান।

৪

বর্ণিতে শকতি ধরে কাহার রসনা,
নারীর আছে যে দোষ আপন চরিতে,
ললনা-হৃদয়ে কী যে আছে গুণপনা
আমাদের জ্ঞানে তাহা পারি না বুঝিতে।

৫

নিশ্চয় ধাঁধায় পূর্ণ তাদের নয়ান
যারা ভাবে প্রমদায় আদরের ধন;
করে না প্রদান যারা নারীর সম্মান,
তাহারাই দূরদর্শী কবি বিচক্ষণ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১-১৯৫১

পালকির গান

চলে চলে
হুমকি তালে
পংখী গালে
মাসি পিসি
বাঘবেড়ালে।

ভূতপেরেতে
চলছে রেতে
হনহনিয়ে
ভূতপেরেতে।

পালকি দোলে
উঠতি আলে
নালকি দোলে
নামতি খালে।

আলো-আঁধারে
শেওড়া গাছ
কালোয় সাদায়
বেড়াল-নাচ।

মরা নদী
বালির ঘাট
মনসাতলায়
মাছের হাট।

ভূতের জমা
ভূতের জমি
ভূতপেরেতের
নাইকো কমি

উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে
চলছে কতক
হনহনিয়ে

চলছে কতক
গাছতলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে।

দিন-দুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাত দুপুরে
হুতোম থুমোয়।

ভোঁদড় ভাম
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি
টিকটিকি আর
কানামাচি।

গঙ্গাফড়িং
জোনাক পোকা
আরসোল্লা
ন্যাংটা খোকা।

ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁকশেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল।

সব ভূতুড়ে
সব ভূতুড়ে
ঘূর্ণি হাওয়ায়
চলছে ঘুরে

জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুলছে কুলো!

সব ভূতুড়ে
সব ভূতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে।

সব ভূতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইঁটের ঢেলা...

সাজ

পোশাগে সেজে নাও হে নাও
বেশটা বেছে নাও হে নাও,
খোশমেজাজে সাজ ফেরাও
মুখেতে মুখট লটকে নাও,
ঘুমত ঘুমত রপাট যাও।
সাজতে সাজে লাজ কিবা
পোশাকে মশয় দোষ কিবা
সাজ ফেরাও সাজ ফেরাও।
চিন তাতারে আইলে চিন সিঙ্গাপুর মাঞ্চুরিন
সুমাত্রা জাভা পুলি পোলাও
ড্যাব ড্যাব্যা করে নাও গে নাও।
সাজলে সাজে তাজে বেতাজ রাবণে রাজে রক্ষোরাজ
সভাতে সাজে রাত্রিদিন
মাজেন্দ্রান মান্দারিন
মান্দলেও আন্দামান।
এসকে এসকে সাজবে গোজবে রাবণরাজার সভায় বসবে
অঙ্গদ বানর দেখলে ঠকবে
ঠেকবে ঠকবে জিতবে না!
তাজা বেতাজা বাজাও বাবা
মজলিশেতে ভোল ফেরাও।

হুক্কার কিচ্ছা

মুছলমান হিঁদুয়ান ছিল জেতের বিচার
ভেবে দেখ তাম্বাকুতে হৈল একাকার।

কাওরা যেথা তামুক খায় বামুন সেথা এসে
আস্তে আস্তে ঘুনিয়ে তার নজদিগেতে বসে।
আড়ে আড়ে চায় এমনি তামাক খাবার বাই
হাত বাড়ায়ে বলে তোমার কলকে দেও না ভাই।
দূর ছাই হুক্কাটা বলছে ছিছ্ছা ছিছ্ছা
বলি শুনেন হুক্কার কিচ্ছা।
এক রোজ আষাঢ় মাসে বাতাস ছিল ছর্দ
ঘরে হুক্কা টানতেছিলাম আমি একা মর্দ।
দর্দ ছিল হস্তে পদে টন্‌টন্‌ বাতের
দলিজোতে বসেছিলাম ইহারি খাতের।
ভাবতেছিলাম ছোটো বিবি থাকত এইখানে
ইত্তিফাক বাঘগর্জন পৌঁছাইল কানে।
হুক্কা হাতে গুটি গুটি যাব খিড়কি দ্বারে
লম্ফ দিয়া কেন্দো বাঘ পড়ল এসে ঘাড়ে।
হলদি কালো ডোরা কাটা শতরঞ্চখানা
ঝড় বেগে উড়ে পল এমনি বাঘের হানা।
তারপর হুড়োহুড়ি বাঁও কসাকসি
যুদ্ধু যেন লেগে গেল বাঘে আর মোষি।
বাঘের শক্তি মান্‌ষের বুদ্ধি কে জেতে কে হারি
করে তাগ বাঘের নাক মারলাম হুক্কার বাড়ি।
নাক ভাঙা বাঘ তো পালাক আঁক আঁক করে
ধীরে সুস্থে জল নিলাম হুক্কাটায় ভরে।
ভাঙে নাই নলচিটা নসীবে আমার
সেই হতে দেখা নাই ছাগলটির আর।
এইখানে হইল সারা অধীনের কেচ্ছা
সেই হতে হুক্কাটা ভাই বলছে মিছ্যাঃ মিছ্যাঃ।

চটজলদি কবিতা

'সমুদ্রটা কেমন ঠেকল
চক্কোত্তিমশয়!'
'যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটা নয়!'
'হুঁকোটা ন্যেন খুলে কন
ধুলো পায়ে কেমন হল
সমুদ্র মজ্জন।'
'মশয় কিত্তিবাসে পড়েছিলেম
সাগর বর্ণন —
"তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে
এক এক জলজন্তু পর্বত প্রমাণ
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান।"
বাসাবাড়ি হতে দেখলেম
যা ভেবেছিলেম তার কিছুই নয়।'
'তবে কেমন দেখলেন?'
' "সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি"
এ যে খড়ে নদীর খাল মশয়!
কোনো চিন্তা নাই, গামছাখানা কাঁধে
তেল মেখে গেলেম ডুব দিতে একলাই।
দর্প ছিল কেষ্‌নগরে কলেজের ছেলে
অবহেলে সাঁতরে খড়ে পারাই
কাছে গিয়ে দেখি কিত্তিবাস যা লিখে গেছে তাই
উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল কূলকিনারা নাই

পাড় হতে ঢেউ দেখেই লাগল ভয়
বলি, ও চক্রবর্তী, আর নিকটবর্তী হওয়া নয়।
বুঝি না কোন্ সাহসে
সাগরের এত কাছে আছেন বসে
বেঁধে বালির ঘর—
বাপ রে বাপ্ কী জলের ডাক!
বুঝি না সারারাত জগন্নাথের
কী প্রকারে ঘুম হয়—
আমরা মানুষ বই তো নয়।'
'সাহেব-সুবা রয়েছে আপনার কী ভয়!'
'ওই একটা কথা ; দ্যেন হুঁকোটা
কুয়োতলাটা ঘুরে আসি চট্‌জলদি —
হুঁকোর 'পর থেকে উড়ে যেতে চায় কল্কি
কাজেই উড়িষ্যা দেশ এরে কয়।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৭৩ ১৯৩২

কাব্যবিজ্ঞান : বৈজ্ঞানিক গবেষণা

পদার্থ-বিজ্ঞানে এত উন্নতি হইল;—
তাড়িত ছুটিয়া
ধরা প্রদক্ষিণ করি একাদশ বার
নিমেষেই আসিছে ফিরিয়া;
প্রণয়-বিজ্ঞানে তবে কেন না হইবে ?
আমরা করেছি আবিষ্কার:
চুম্বনের বিনিময় বিরহী-প্রণয়ী
স্বচ্ছন্দে করিবে এই বার !

পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে ছাদের উপর উঠি
প্রণয়ী বা প্রণয়িনী আছেন যেখানে—
মানচিত্রে সেই গ্রাম, নগর অথবা পল্লী
যে দিকে অঙ্কিত, মুখ ফিরি তার পানে,
তিন বার প্রিয়-নাম মৃদু উচ্চারণ করি
একটি চুম্বন দিবে বাতাসে ছাড়িয়া।
তিন বার সেই নাম আবার করিবা মাত্র
শতটি প্রতিচুম্বন পাবে ফিরাইয়া।

ধাতু যথা তাড়িতের সু-পরিচালক,
সেইরূপ, (আমরা করেছি আবিষ্কার)
প্রণয়ীর চুম্বনের পূর্ণিমা-কিরণ।
প্রার্থনীয় পরীক্ষা সবার।

রাজশেখর বসু

১৮৮০-১৯৬০

হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র

হবুচন্দ্রকে বললে রাজ্যের যত লোক,
হে মহারাজ ধর্মাবতার,
আমাদের আরজিটা শুনুন একবার
গবু মন্ত্রীকে শূলে চড়াতে আজ্ঞা হোক।
ব্যাটা অকর্মণ্য ঘুষখোর,
পয়লা নম্বর চোর,
ওর জন্যে আমরা খেতে পরতে পাই না।
যদি না পারেন রাজার কাজ
তবে কী করতে আছেন মহারাজ?
চলে যান, আপনাকে আমরা চাই না॥
হাই তুলে বললেন হবুচন্দ্র,
এরা বলে কী হে গবুচন্দ্র?
গবু বললেন, আঃ কী জ্বালাতন,
দোষ ধরাই ওদের স্বভাব।
শিখেছেন তো তার জবাব,
আউড়ে দিন তোতাপাখির মতন॥
হেঁকে বললেন হবুচন্দ্র নরপতি,
ওহে প্রজাবৃন্দ, শান্ত হও, ধৈর্য ধর,
না বুঝেই কেন চেঁচিয়ে মর,
তোমরা অবোধ ছেলেমানুষ অতি।
তোমাদের নালিশ মিথ্যে আদ্যন্ত,
স্বয়ং গবুচন্দ্র করেছেন তদন্ত।
তোমাদের কিঞ্চিৎ টানাটানি,
কিঞ্চিৎ এটা ওটা সেটা দরকার

আছে তা অবশ্যই মানি।
শীঘ্রই হবে তার প্রতিকার।
স্বর্গ থেকে আসছে মালী এক দল,
সঙ্গে নিয়ে কল্পতরুর বীজ,
ষাট বছরে ফলবে তার ফসল,
পাবে তখন হরেক রকম চীজ।
তদ্দিন বাপু সয়ে থাকো চক্ষু মুদে,
বাজে খরচ কমাও,
দেদার টাকা জমাও,
আমার কাছে রাখো আড়াই-পারসেন্ট সুদে॥

ঘাস

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকগণ,
এবং আর সবাই যাঁদের এ পাড়ায় বাস,
মন দিয়ে শুনুন আমার অভিভাষণ,
আজ আমাদের আলোচ্য— Eat more grass!
অর্থাৎ আরও বেশি ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ, ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বলাধান,
দেদার ক্যালরি, প্রোটিন ও ভাইটামিন,
ঘাসেই হবে অন্নসমস্যার সমাধান।
এই দেখুন না, হরিণ গো মহিষ ছাগ
সেরেফ ঘাস খেয়েই কেমন পরিপুষ্ট,
আবার তাদেরই গোস্ত খেয়ে বাঘ
কেমন তাগড়াই কেঁদো আর সন্তুষ্ট।
যখন ঘাস থেকেই ছাগল ভেড়ার পাল
তথা ব্যাঘ্র শৃগালাদি জানোয়ার পয়দা,
তখন বেফায়দা কেন খান ভাত ডাল
মাছ মাংস ডিম দুধ ঘি আটা ময়দা?

দেখুন জন্তুরা কী হিসেবি, এরা কদাপি
খাটের ওপর মশারি টাঙিয়ে শোয় না,
এরা কুইনিন প্যালুড্রিন খায় না, তথাপি
এদের ম্যালেরিয়া কস্মিনকালে ছোঁয় না।
এরা কুসংস্কারহীন খাঁটি নিউডিস্ট,
ধুতি শাড়ি ব্লাউজ অমনি পেলেও নেয় না,
এরা আজন্ম অদৃষ্টবাদী ফেটালিস্ট,
মাননীয় মন্ত্রীদের বেহুদো গাল দেয় না।
এদের কাছে শিখুন। যদি আপনারাও চান
এই অতি আরামের আদর্শ জীবনযাত্রা,
তবে আজ থেকেই উঠে পড়ে লেগে যান,
সব কমিয়ে দিয়ে বাড়ান ঘাসের মাত্রা।।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

১৮৮১ ১৯৬৮

কলকাতার ভুল

মরি হায় রে, কলকাতা কেবল ভুলে ভরা।
সেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে, বোকায় পড়ে ধরা!
আজকাল কলকাতাতে সব কথাতে দেখছি ভারি ভুল,
কি বা করি, ঘুরে মরি নাই কিনারা কূল।
ভাবলাম কলুটোলায় কলু আছে, আছে তাদের ঘানি,
দেখি কলুর বলদ বদ্যি সেথায় করে তেল আমদানি!
আমি মুরগিহাটায় চুপ করে যাই কিনতে রামপাখি,
দেখি সারি সারি স্টেশনারি, আসল জিনিস ফাঁকি!
ভাবলাম চীনাবাজারেতে শুধু চীনে থাকে খালি,
দেখি ঘরে ঘরে দোকান করে যত সব বাঙালি!
ভাবলাম রাধাবাজার আছে বুঝি শ্যামবাজারের বাঁয়ে,
দেখি শ্যাম গিয়েছে বহু দূরে রাধার মানের দায়ে!
লালবাজারে গিয়ে একটু ঘুচল তবু ধাঁধা,
লাল-বাজার তো নাই, লোকের মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধা!
ভাবলাম লালদিঘিতে দেখব গিয়ে জলটি লাল টকটকে,
দেখতে গিয়ে বেকুব হয়ে এলাম শেষে ঠকে!
নাইক হাতি, নাইক বাগান, হাতিবাগান বলে,
বাদুড়বাগানেতে দেখি বাদুড় নাহি ঝোলে!
নেবুতলায় গিয়ে দেখি নেবু নাহি মিলে,
বৌবাজারের নামটা কেন শুধু শুধু দিলে!
কাঁকুড় কিনব বলে একদিন কাঁকুড়গাছি গেলাম,
সেথা কাঁকুড় তো নাই— যোগোদ্যানে ঠাকুর দেখে এলাম।
বিয়ে করলে স্বামী হয়, সে আগে জানতাম আমি,
হেথায় মাথা-নেড়া গেরুয়া-পরা বিয়ে না-করা স্বামী।

রাজ্যহীন মহারাজ কি বা রাজপোশাকের শোভা,
মহারাজ মরলে মহারাণী হবে না বিধবা!
একটা সাঁকো নাইক সেথায়, জোড়াসাঁকো নাম,
সেথা দিনে রাতে রবির উদয় দেখে আসিলাম!
ভাবলাম চোরবাগানে চোরে লোকের করে সর্বনাশ,
ও মা সেথায় গিয়ে দেখে এলাম সাধুজনের বাস।
ভাবলাম বাগবাজারে গেলে বুঝি বাঘে খাবে ধরে,
দেখি থাকেন সেথা মদনমোহন গোকুল মিত্রের ঘরে।
ভাবলাম ধর্মতলায় অধর্ম নাই, ধার্মিকেরাই থাকে,
দেখি চাঁদনিতে এক টাকার জিনিস তিন টাকা দর হাঁকে!
চাষাধোপাপাড়ায় দেখি বামুন কায়েত থাকে,
কোন্ হতচ্ছাড়া ধোপাপাড়া নাম দিয়েছে তাকে!
উল্টোডিঙি দেখতে গিয়ে বাড়ালাম জঞ্জাল—
দেখি সোজা ডিঙি ভরতি আছে উল্টোডিঙির খাল!
ভাবলাম সাত রাজার ধন মানিক বুঝি মানিকতলায় থাকে,
খানিক পেলে খুঁজে ট্যাঁকে গুঁজে পালাতাম এক ফাঁকে।
শিয়ালদহে নাইক শেয়াল, নামটা শুধু ভুয়া,
কেবল রেলের গাড়ি শ্যালের মতো করছে হুক্কা হুয়া!
এই সব ভুলে ভুলে ঘুরে ঘুরে বাত ধরল গিঁটে,
দেখি গোঁসাইঠাকুর ঠুকছে সেলাম মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে।
ভুলে ভুলে ঘুরে ঘুরে আছি বেশ রগড়ে,
দেখি ইসলামভায়াও বাঁধল বাসা বরাহনগরে।
ধাঁধায় পড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই হাটে মাঠে—
একদিন দেখতে যাব নিমের গাছটি নিমতলার ঐ ঘাটে!

গুরুসদয় দত্ত

১৮৮২-১৯৪১

'পাগলামির পুঁথি' থেকে

১

ছিলেন এক আরামবাগের আমলা,
হত যখন কোনো মামলা,
দিয়ে দুই পক্ষকেই আশা
করতেন আমদানিটি খাসা,
আরামবাগের অমায়িক সেই আমলা।

২

কুস্থলের এক কবি
দেখতেন কল্পনাতে ছবি—
একদিন বাঘকে ভেবে মেষ
করলেন ভবলীলার শেষ,
কুস্থলের সেই কল্পনাশীল কবি।

হতেম যদি

হতেম যদি বদ্যি, রোগী চাইলে খেতে পথ্যি
সাগু বার্লি ছাড়া করতেম সবেতেই আপত্তি।

হতেম যদি হাকিম, উঁচু এজলাসেতে ব'সে
চক্ষু বুজে দিয়ে দিতেম ফাঁসীর হুকুম কসে।

হতেম যদি ডাক্তার, কানে দিয়ে স্টেথিস্‌কোপ
একশো টাকা ভিজিট নিতেম কোঁকড়া করে গোঁফ।

হতেম যদি জমিদারের নায়েব কি গোমস্তা,
হাটে গিয়ে নিতেম তুলে মতিচুরের বস্তা।

হতেম যদি গবর্মেন্টের উচ্চ কর্মচারী
বড্ড মজা হত রে ভাই, কেবল খবরদারী।

হতেম যদি কোনো জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কি জজ,
মনে হত আমার মতো নাই কোনো দিগ্‌গজ!

কিম্বা যদি হতেম ধনের কুবের মারোয়াড়ী,
বড়োবাজার ছেড়ে করতেম বালীগঞ্জে বাড়ি।

অন্তত ভাই পাঠশালাতে হতেম যদি গুরু,
বেত্র এবং ছাত্র নিয়ে কর্ম হত শুরু।

কাউন্সিলের সদস্য যদি হতেম জিতে ভোটে,
উড়িয়ে দিতেম গবরমেন্টকে গলাবাজীর চোটে।

হতেম যদি এটর্নি, কি উকিল, কিম্বা মোক্তার,
খুলে দিতাম আদালতে দোকানদারী দোক্তার।

হতেম যদি আরো যা-সব হতে ইচ্ছে করে,
তা হলে কী করতেম সেটি ভেবে বলব পরে।

কেন মিছে ভেবে মরো

এ সংসারে যত কিছু আপদ আছে ভাই,
তার হয়তো কোনো উপায় আছে, হয়তো উপায় নাই!
যদি থাকে উপায়, তারে ভেবে বের করো,
আর উপায় না থাকিলে কেন মিছে ভেবে মরো?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৮৮২-১৯২২

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ্', 'বরোফ্'
লোপ!
উড়ি উড়ি আরসুলা দেয় তুড়ি লাফ
সাফ্!
পালকি-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
তুড়ে!
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উঁচা
ছুঁচা!
পাহারালা ঢুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ
খোদ!
বেতালা মাতালগুলা খায় হালফিল
কিল!
তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত
চিৎ!
যুত পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুৎ
ভূত!
নির্-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গোঁফা
তোফা!
গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড়সুড়
শুঁড়!
স্বপ্নে দেখে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব
জেব!

পূজ্য হন গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে
বেড়ে!
ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাদুর
বাদুড়!
ছেঁচা-বোঁচা কালপেঁচা চেঁচায় খিঁচায়
কী চায়?
সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মাম্‌দোর গোর
চোর!
আবরি সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে
দন্তে!
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক
নাক!
স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়মিড়
বিড় বিড় বিড়!

অম্বল-সম্বরা কাব্য

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা!
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে;
আম্বা করি পুনঃ ঢালিলা জাম্বাটি ভরি
খাব বলি; কহ দেবী তম্বুরা-বাদিনী!
কোন্ জাম্বুবান নৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত!

কম্বুরবে অম্বুনিধি মহাতম্বী করি
আইলা অম্বল-লোভে লোভী; শম্বুকেরা
কৈল হুড়াহুড়ি জলতলে, জম্বুকেরা
হুক্কা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
দিবাভাগে! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
শুম্ভ-নিশুম্ভের কাটা-মুণ্ডে শুষ্ক জিভে
এল জল; জগঝম্প বাজিল দেউলে।
সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইয়া মুখ!
বোম্বাইয়ের আঁঠি ফেলি বিম্বৌষ্ঠী দৌড়িলা!
সুদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
হাসিল গ্রাম্ভারি যত জজ! লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে; শাম্ব দ্বারকায়।
গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈয়ে!
অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি!
কম্বক্তা সম্বরাসুরে না করি বম্বার্ড
দম্ভোলি নিক্ষেপি ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
দাম্বাল উলঙ্গ দুম্বো চাষা-ছেলে সাজি
আইলা শম্ভুর দ্বারদেশে! গোষ্ঠে গাভী
কৈল হাম্বারব! হাম্বীর ভাঁজিল গুণী
মনোভুলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাকু!
কিম্বদন্তী কয়, চুম্বনে অরুচি হৈল
নবদম্পতীর সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ-
মন। হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন
ঈর্ষ্যাবশে। হিংসাভরে রম্ভা হৈল বীচে।
কলম্বোর কুম্ভকর্ণ জাগিল; কবরে
মোল্লা দোপিয়াজা দিল্লীধামে, ফুল্লমন
সম্বরা-সৌরভে! কৈলাসে স্বনামধন্য
শূলী শম্ভু বাজাইলা আনন্দে ডম্বরু
মালীশম্ভুকৃত অম্বলের গন্ধামোদে,
দিগম্বর ববম্বম্ বাজাইলা গাল!

পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাম্বরে— জগবন্ধু-
সূপকার উড়িয়ার রন্ধন-গৌরবে!
গেরম্বারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজ মনে
কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃক্‌পাত
জাম্বাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে।।

বর্ষার মশা

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে, খালি শোনো শন্‌শন্‌,
ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো দেয় বা থামিয়ে ভ্রমরের গুঞ্জন!
বাণীর অরুণ চরণ ঘিরে যে রক্তকমল শোভে,
রঙে ভুলে তার দলে দলে মশা ছুটেছে রক্তলোভে!
আদাড়ের মশা পাঁদাড়ের মশা জুটেছে মানস-সরে,
রক্তপদ্মে রক্ত না পেয়ে ছেঁকে ধরে মধুকরে!
চপল পাখায় বাণীর চরণ করিয়া প্রদক্ষিণ
ভারতীরে ভণে ভ্রমর, 'হায় মা! এ কি হেরি দুর্দিন!
কোথা হতে এল ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো? উড়ে উড়ে সারে সারে
জুড়ে বসে হের রক্তপায়ীরা মধুপের অধিকারে!
বিশ্রাম নাই 'পঙ্‌ পিঙ্‌ পাঁই' রব করে ফিরে ঘুরে
'মোরাও ভোমরা' ভণিতা করিয়া ভণে যেন নাকী সুরে!
বিকট জরার শাকটিক ওরা রোগের বাহন জানি,
সহসা ওদের হেরে বাণী-গেহে মনে আতঙ্ক মানি।
মানসের জল হল কি গরল? হৃদয় কাঁপিছে ত্রাসে!
বাণীর চরণ ঘিরিল কি এরা পেট পোরাবার আশে!'
হেসে বাণী কন, 'কেন উন্মন কমললোভন ওরে!
ঘোলাটে রাতের অপচার ওরা। প্রভাতেই যাবে স'রে।
রবির আলোয় ঘোর আপত্তি সত্যি ওদের আছে,
কোনো ভয় নাই পেচকের হাই, ভোরাই আলোর আঁচে
হবে অদৃশ্য; তাড়াতে হবে না কিটিঙের গুঁড়া দিয়া,
হবে না তা ছাড়া মশার কামড়ে ভোমরার ম্যালেরিয়া।'

জ্যৈষ্ঠী মধু

আহা ঢ্যকরিয়ে মধু-কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি
টুলটুলে তাজা ফুলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি!

হের কুল্ কুল্ কুল্ বাস-ভরা
শুরু হয়ে গেছে রস ঝরা,
ভোমরার ভিড়ে ভিমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিলকুলই!

তারা ঝাঁক বেঁধে ফের চাক ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আওরা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুলবুলি।

কত বোলতা সোনেলা রোদ পীয়ে
বুঁদ হয়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে;
ফলসা-বনের জলসা ফুরুলো,
মৌমাছি এল রোল তুলি।

ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ ফুলের ফাগ-মাখা
ঢুলঢুলে কার চোখদুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি!

আজ ঝড়ে হানা ডাঁটো ফজলি সে
মেশে কাঁচা-মিঠে মজলিশে;
'রঙ-চোরা ফলে রস কী জোরালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি।

ওগো কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে।
জামরুলি মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে
তাপে কাঁপে তবু জুঁইফুলি!

মরি, ভোমরা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া করে দুটো পাখনাকে—
ফলের মধুর মরশুম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি!

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১৮৮২-১৯৭০

রেঙ্গুন-রঙ্গিণী

বসতি তাহার ম্যাণ্ডালে,
দেখা নৃত্যের প্যাণ্ডালে,
স্মর-গরল সে খণ্ডালে।
মেলামেশা হল একদা রে,
মনে পড়ে সেই প্যাগোডা রে,
ফুলডোর দিনু জড়াইয়া
জড়াইয়া কালো কুন্তলে।
ভাবিতাম ফুলরানী তারে,
রূপসী বলিয়া জানি তারে,
বাঁশিতে তাহার হাসিতে গো,
তরুণী আমারে ভণ্ডালে।
মত্ত ছিলাম গুঞ্জনে,
আঁখির অমিয়া ভুঞ্জনে,
বিনিময় হল অজ্ঞাতে
মোর চটি তার স্যাণ্ডালে।
তার পরে গেছে যুগ বহি,
অশ্রু ঝরেছে বুক বহি,
প্রিয় সখী রাজে রেঙ্গুনে,
আমি কাজ করি অণ্ডালে।

সতীশচন্দ্র ঘটক

১৮৮৫-১৯৩২

সোনার ঘড়ি

গগনে উদিল উষা, হল ফরসা,
ঘরে একা বসে আছি, নাহি ভরসা;
রাশি রাশি ভারা ভারা বই পড়া হল সারা
ব্রীফ নাই পড়ি ধারা, আঁখি সরসা;
পড়িতে পড়িতে বই হল ফরসা।

একখানি ছোটো মেস্, আমি একেলা,
চারিদিকে বকা ছেলে করে জটলা;
দ্যালে ঝোলে দেশী-আঁকা কালী তারা কালিমাখা,
আমদানি নাহি টাকা প্রভাতবেলা,
চেয়ারেতে বসে তাই ভাবি একেলা।

পান খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে কে আসে দ্বারে?
মক্কেল মনে হয় যেন উহারে,
ভারী চালে চলে যায়, কোনো দিকে নাহি চায়,
আশাগুলি নিরুপায় করে হা হা রে,
মক্কেল মনে হয় যেন উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও— বাড়ি, কি দেশে—
বারেক দাঁড়াও মোর নিকটে এসে;
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি কেস্ দাও।
আগে তো তামাকু খাও ক্ষণেক বসে?
উপদেশ কিছু মোর লইয়ো শেষে।

খাও, খাও, রাখো কেন মেঝের 'পরে ?
আছে কিছ? নাই বুঝি,— দিতেছি ভ'রে,
এতকাল পুঁথি খুলে যা কিছু খেয়েছি গুলে
খাটাব তা বিনা মূলে তোমারই তরে,
আমারে উকীল দাও করুণা ক'রে।

কেস্ নাই, কেস্ নাই, ছোটো চাকরি,
মামলা বলুন দেখি কেমনে করি ?
এত বলি ধীরে ধীরে গেল সে চলি বাহিরে
শূন্য চেয়ারে আমি রহিনু পড়ি ;
চেয়ে দেখি, নিয়ে গেছে সোনার ঘড়ি।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৮৮৬-১৯৬৫

জমিদার

আমি রাজা, মোর রাজ্যে চিরানন্দ, চির-মহোৎসব,
নাহি দুঃখদৈন্যলেশ ।— জলাভাব ? তাও কি সম্ভব ?
গ্রামে গ্রামে দিঘি ডোবা খাল বিল-আদি জলাশয়,
বিমল হরিতকান্তি, পানাঢাকা, চির শান্তিময়।
যাদের শীতল ক্রোড়ে সন্তাপিত অঙ্গ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়; মানুষ মোষ মেষ বৃষ হৃদয় ভরিয়া
পান করি লয় সুধা, প্রাণময় লক্ষ জীবাণুর,
সাগ্রহে, দশটা মাস, তবু আজ শুনি এ কী সুর।
চতুর্দিকে আর্তনাদ, কীর্তিনাশা দৃপ্ত কোলাহল,—
'পিপাসায় কণ্ঠ ফাটে; বক্ষ ফাটে; দাও দাও জল।'
'কোথা জল? কোথা জল?' — অভ্রভেদী শব্দ হাহাকার—
অকৃতজ্ঞ কৃষকের দুর্বিনীত দারুণ চীৎকার।
বৈশাখের খরদাহে তপ্ত, দগ্ধ ধরণীর ধুলা,—
শুকাইছে নদী-নালা, শুষ্ক হয় পুষ্করিণীগুলা;
সে দোষ আমার নহে। লাইমেড সোডা প্রভৃতিতে
আমি করি নাই মানা নিদারুণ তৃষ্ণা নিবারিতে।
অন্নকষ্ট? মিথ্যা কথা। শস্যভারে নম্র বঙ্গভূমি,
বিরাজে শ্যামল ক্ষেত্র দিক্ হতে দিগন্তর চুমি;
এ সব কাহার? এই পরিপূর্ণ অক্ষয় ভাণ্ডার
চিরমুক্ত কার তরে? কৃষকেরই। তবু অনাহার?
নাই চাই রাজকর, শস্যভাগ। লই শুধু টাকা,
অপেয়, অখাদ্য, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ অতি, রজতের চাকা,
— Nominal value— তবু অনাহারে মরে যে দুর্ভাগা
কে তারে আহার দিবে? বিধাতার অভিশাপ দাগা

তার ভালে। শীর্ণকায় প্রজাগণ? সে ভাই বরাত!
আমিও তো জন্মিয়াছি বঙ্গদেশে, খাই ডাল, ভাত।
তবু দেখ ফুলি রোজ ; পাঞ্জাবি সে গেঞ্জি সম আঁটে,
পদভারে প্রতিদিন আন্‌কোরা Pump shoe- জোড়া ফাটে।
কলেরা, বসন্ত, জ্বরে জর্জরিত, অর্ধমৃত দেশ?
জানি তাহা। কিন্তু হায়, উপায়ের না পাই উদ্দেশ।
রোগ, শোক দেবতার হাত। আছে একটি সম্বল,
পলায়ন! তাই আমি পরবাসী। গ্রাম্য মূর্খদল,
তারাও বাঁচিতে পারে পলাইয়া অমারই মতন
শহরের সৌধচূড়ে, নিরাপদে, নিরুদ্‌বিগ্নমন।
তবে কেন পড়ে থাকা, রোগমাখা দুঃখমসী-আঁকা,
অন্ধঘন বাঁশবন, অন্ধতম ঝোপঝাড়ে ঢাকা,
পিচ্ছিল বন্ধুর ভূমি, চড়া, গাড়া, গভীর কর্দম,
পাগলা শৃগাল, জোঁক, সর্প, ভেক, বৃশ্চিকে দুর্গম
পাড়াগাঁর পূতিগন্ধে, নাক গুঁজে চোখ মুখ বুজে?
শরীরের রস দিয়া কেন তবে, আত্মনাশ খুঁজে
পুষ্ট করি তোলা দুটো পেট জোড়া প্লীহা ও লিভার?
অজ্ঞতা? সে হতে পারে। তুমি চাও শিক্ষার বিস্তার?
না হয় করিনু সেটা। তার পরে কোন্ বেটা করে
বল তো আমার কাজ? কে সাজিবে পান? সমাদরে
কে দুলাবে তালবৃন্ত ক্লান্তিহরা, যবে শ্রান্তকায়
দিবসের তন্দ্রাশেষে, সন্ধ্যাকালে ঢুলে তাকিয়ায়?
সট্‌কা এগিয়ে দেওয়া, সুকোমল অঙ্গে তেল ঘষা,
কে করিবে এই সব? তাড়াতাড়ি কে তাড়াবে মশা
ভুঁড়ি হতে, হস্ত যেথা অর্ধ-পথে ব্যর্থ ফিরে আসে,
হারায় দৃষ্টির সীমা, জ্ঞান মৌন নিষ্ফল প্রয়াসে?
আমি করি অন্য রূপে প্রজাদের দুঃখের লাঘব।
বারো মাসে তেরো পর্বে বেড়ে যায় প্রজারই বৈভব।
প্রজাই বাজায় বাঁশি, কাঁসি, ঢোল। দেখে হৃষ্ট-চিতে
হাজার হাজার মুদ্রা ফুকে দিই আতশ-বাজিতে।

দেশের ভূস্বামী আমি, মোর কাজে লাভবান্ সবে।
এই দেখ ঘটা করে প্রতিবার শারদ-উৎসবে
কত শত নিরন্নেরে তপ্ত লুচি পোলাও খিলাই,
জীর্ণ-চীর দরিদ্রেরে শান্তিপুরী চাদর বিলাই।

সুকুমার রায়

১৮৮৭-১৯২৩

মন্ত্র

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাটকেল চিৎপটাং
গন্ধগোকুল হিজিবিজি
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সা রে গা মা
নেই মামা তাই কানা মামা
চিনেবাদাম সর্দি-কাশি
ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি
মুশকিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

কলিকাতা কোথা রে

গিরিধি আরামপুরী, দেহ মন চিৎপাত;
খেয়ে শুয়ে হু হু করে কেটে যায় দিনরাত।
হৈ চৈ হাঙ্গামা হুড়োতাড়া হেথা নেই;
মাস বার তারিখের কোনো কিছু ল্যাঠা নেই।
খিদে পেলে তেড়ে খাও, ঘুম পেলে ঘুমিয়ো—
মোট কথা, কী আরাম, বুঝলে না তুমিও!
ভুলেই গেছিনু কোথা এই ধরাধামেতে
আছে সে শহর এক কলকেতা নামেতে
হেনকালে চেয়ে দেখি চিঠি এক সমুখে
চায়েতে অমুক দিন ভোজ দেয় অমুকে।

কোথায় ? কোথায় ? বলে মন ওঠে লাফিয়ে
তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তেড়ে ধরি চাপিয়ে;
ঠিকানাটা চেয়ে দেখি নিচু পানে ওধারে
লেখা আছে 'কলিকাতা'— সে আবার কোথা রে!
স্মৃতি কয় 'কলিকাতা ? রোসো দেখি, তাই তো!
কোথায় শুনেছি যেন— মনে ঠিক নাই তো!'
বেগতিক শুধালেম সাধুরাম ধোপারে;
সে কহিল, 'হলে হবে উশ্রীর ওপারে।'
ওপারের জেলে বুড়ো মাথা নেড়ে কয় সে
'হেন নাম শুনি নাই আমার এ বয়সে।'
তারপরে পুছিলাম সরকারী মজুরে;
'তমাম মুলুক সে তো বাংলার "হুজুরে"—
বেঙাবাদ, বরাকর, ইদিকে পচম্বা
উদিকে পরেশনাথ, পাড়ি দাও লম্বা—'
সব তার সড়গড়, নেই কোনো ভুল তায়
'কলিকাতা কাঁহা!' বলি সেও মাথা চুলকায়।
অবশেষে নিরুপায় মাথা যায় খুলিয়ে
'টাইমটেবিল' খুলে দেখি চোখ বুলিয়ে!
সেথায় পাটনা, পুরী, গয়া, গোমো, মাল্‌দ
বজবজ, দমদম, হাওড়া ও শিয়াল্‌দ
ইত্যাদি কত নাম চেয়ে দেখি সামনেই
তার মাঝে কোনোখানে কলিকাতা নাম নেই!
— সব ফাঁকি বুজরুকি রসিকতা-চেষ্টা!
উদ্দেশে 'শালা' বলি গাল দিনু শেষটা॥

সহসা স্মৃতিতে যেন লাগিল কী ফুৎকার
উদিল কুমড়া হেন চাঁদপানা মুখ কার!
আশেপাশে টিপিটুপি পাহাড়ের পুঞ্জ
মুখ চাঁচা ময়দান, মাঝে কিবা কুঞ্জ!

সে শোভা স্মরণে ঝরে নয়নের ঝরনা
গৃহিনীরে কহি, 'প্রিয়ে! মারা যাই, ধর না।'
তারপরে দেখি ঘরে অতি ঘোর অনাচার —
রাখে নাকো কেউ কোনো তারিখের সমাচার!
তখনই আনিয়া পাঁজি দেখা গেল গনিয়া
চায়ের সময় এল একেবারে ঘনিয়া!
হায় রে সময় নাই, মন কাঁদে হতাশে—
কোথায় চায়ের মেলা! মুখশশী কোথা সে!
স্বপন শুকায়ে যায় আঁধারিয়া নয়নে।
কবিতায় গলি তাই গাহি শোক শয়নে।

হোম ভিলা। বারগণ্ডা, গিরিধি ৮.১.১৯২২

ছায়াবাজী

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যাবসা করি তাও জানো না বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি!
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালের শুক্‌নো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশপথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।
কাগের ছায়া বগের ছায়া দেখছি কত ঘেঁটে—
হাল্কা মেঘের পান্‌সে ছায়া তাও দেখেছি চেটে।
কেউ জানে না এসব কথা কেউ বোঝে না কিছু,
কেউ ঘোরে না আমার মতো ছায়ার পিছু পিছু।
তোমরা ভাবো গাছের ছায়া অমনি লুটায় ভুঁয়ে,
অমনি শুধু ঘুমায় বুঝি শান্ত মতন শুয়ে;

আসল ব্যাপার জান্‌বে যদি আমার কথা শোনো,
বল্‌ছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখ্‌তে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছটফটিয়ে এদিক্ ওদিক্ চায়।
সেই সময়ে গুড়্‌গুড়িয়ে পিছন হতে এসে
ধামায় চেপে ধপাস্ করে ধর্‌বে তারে ঠেসে।
পাৎলা ছায়া, ফোক্‌লা ছায়া, ছায়া গভীর কালো—
গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভাল
গাছগাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে,
বাপ্ রে ব'লে পালায় ব্যামো ছায়ার ওষুধ খেলে।
নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাক্‌বে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো।
শুঁকলে পরে সর্দিকাসি থাক্‌বে না আর কারও।
আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়,
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।
আষাঢ় মাসের বাদলা দিনে বাঁচতে যদি চাও,
তেঁতুল তলার তপ্ত ছায়া হপ্তা তিনেক খাও।
মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে,
ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখ্‌ছি ঘরে পুষে।
পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি
দাম করেছি সস্তা বড়ো, চোদ্দ আনা শিশি।

আহ্লাদী

হাস্‌ছি মোরা হাস্‌ছি দেখ, হাস্‌ছি মোরা আহ্লাদী;
তিন জনেতে জটলা ক'রে ফোক্‌লা হাসির পাল্লা দি।
হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে দাদা আস্‌ছি আমি আস্‌ছে ভাই,
হাস্‌ছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাস্‌ছি তাই।

ভাব্‌ছি মনে, হাস্‌ছি কেন ? থাক্‌ব হাসি ত্যাগ ক'রে,
ভাবতে গিয়ে ফিক্‌ফিকিয়ে ফেল্‌ছি হেসে ফ্যাক্ ক'রে।
পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ্ বুজে,
পাচ্ছে হাসি চিম্‌টি কেটে নাকের ভিতর নখ্ গুঁজে।
হাস্‌ছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়
নৌকা ফানুষ পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড়।
পড়তে গিয়ে ফেল্‌ছি হেসে 'ক খ গ' আর শ্লেট দেখে—
উঠ্‌ছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।

ভালো রে ভালো

দাদা গো! দেখছি ভেবে অনেক দূর—
এই দুনিয়ার সকল ভালো,
আসল ভালো নকল ভালো;
সস্তা ভালো দামিও ভালো,
তুমিও ভালো আমিও ভালো,
হেথায় গানের ছন্দ ভালো,
হোথায় ফুলের গন্ধ ভালো,
মেঘ-মাখানো আকাশ ভালো,
ঢেউ-জাগানো বাতাস ভালো
গ্রীষ্ম ভালো, বর্ষা ভালো,
ময়লা ভালো ফরসা ভালো,
পোলাও ভালো কোর্মা ভালো,
মাছপটোলের দোল্‌মা ভালো,
কাঁচাও ভালো পাকাও ভালো,
সোজাও ভালো বাঁকাও ভালো,
কাঁসিও ভালো ঢাকও ভালো,
টিকিও ভালো টাকও ভালো,
ঠেলার গাড়ি ঠেলতে ভালো,

খাস্তা লুচি বেলতে ভালো,
গিট্‌কিরি গান শুনতে ভালো,
শিমুল তুলো ধুনতে ভালো,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভালো,
কিন্তু সবার চাইতে ভালো,
—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৭-১৯৩১

আবদারের আধঘন্টা

বেল ফুল চাই না
জুঁই ফুল দাও।
ও গানটা গেয়ো না
এই গান গাও।
কেন ভালোবাসলে
বল, বল না,
হাসলে কেন তুমি
— কথা কব না!

কালকের গল্প
আজ কর শেষ;
আজকের রাতটা
লাগছে না বেশ?
সারাটা বেলা ধরে
বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা
এমনিই ভুল!

জুঁই ফুল চাই না
বেল ফুল দাও,
এ গানটা গেয়ো না
ঐ গান গাও!
জুঁই ফুল নেব না
দাও বেল ফুল—

গোলাপকে পার্শিরা
বলে নাকি গুল?

ও দিকেতে চেয়ো না
চাও এই দিক,
আলোটা নিবে আসে
দাও করে ঠিক;
লাগছে চোখে আলো
করে দাও কম;
ঐ যা, বাতি গেল
নিবে একদম!

হবে নাকো জ্বালতে,
খুব বাহাদুর!
জানা গেছে বুদ্ধি
যায় কতদূর।
বেলফুল চাই না
দাও জুঁইফুল,
পার্শিরা গোলাপকে
বলে নাকি গুল?

জুঁই ফুল চাই না
চাঁপা এনে দাও,
আমি কি তা জানি তুমি
পাও কি না পাও!
কাকাতুয়া কিনে দেবে—
কিনে দিলে খুব!
কথা কেন নেই মুখে
হয়ে গেলে চুপ?

ভালোবাসো কি না বাসো
ঠিক বল না!
চাঁদ ঐ উঠেছে
ছাদে চল না।
মুখে চুন লাগল
ফিরে নাও পান;
মাথা ঘুরে পড়ল
গেয়ো নাকো গান।

চাই না জুঁই-বেল
চাঁপা এনে দাও,
আমি কি তা জানি তুমি
পাও কি না পাও?
চাঁপা ফুল চাই না
চাই চামেলি,
সব তাতে হবে হবে
খালি গাফেলি!

আজ রাতে দুজনাতে
জেগে থাকব,
কে হারে কে জেতে আমি
তাই দেখব!
ছোটো বলে করবে কি
তুই-তোকারি?
তাতে যে গো অপমান
হয় আমারই।

না বলে না কয়ে তুমি
কেন চুমা খাও?

বলি নাকো যত কিছু
আশকারা পাও!
চামেলি সে চাই না
দাও চাঁপা ফুল,
মিঠে তার গন্ধ
গা তুলতুল।

চাঁপা ফুল চাই না
দাও বেল ফুল;
খোঁপা থেকে ঝরে প'ড়ে
গেল বিলকুল!
কুড়িয়ে সব ক-টা
পরিয়ে দাও,
আবার না বলে তুমি
গালে চুমা খাও!

আমি মরে গেলে তুমি
খুব কাঁদবে?
তখন এ বাহুডোরে
কারে বাঁধবে?
ও কি ও কি, চোখ থেকে
পড়ে কেন জল?
মরে কেন যাব আমি
মিছে করি ছল!

জুঁই বেল চামেলি
যা খুশি তা দাও,
ও গালেতে চুমা খেলে
এ গালেতে খাও...

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১৮৮৮-১৯৫৪

বাড়ি ভাড়া

'ড্যাঞ্চি'রা বহ্রমপুরে যবে
ঢুকিতে লাগিল হু হু রবে
লক্ষ্মী বরপুত্রগণে শুধালেন জনে জনে,
দুর্দিনে তোমরা বল কে বা
বাড়ি-হীনে বাড়ি ভাড়া দেবা?

শুনি তাহা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
করজোড়ে কহে, মাতা, খালি হল কলিকাতা,
সবে বাড়ি যোগাইয়া যাই
এমন ক্ষমতা যে মা নাই।

কহিলা স্বয়ং মহারাজ,
আজি মা গো পেনু বড়ো লাজ,
যত বাড়ি ছিল খাড়া সবই হয়ে গেছে ভাড়া.
ভাঙাচোরা— তাও বাগ্‌দত্তা,
খালি বাড়ি নেই আর কোথা।

কহিল রংরাজ মারোয়াড়ী,
বাড়ির মতন ছিল বাড়ি,
জগৎশেঠের নাতি সেখানে রাখিত হাতি,
অগ্রিম কেরেয়া সহ তাহা
রুধিয়া রেখেছে মতি লাহা।

রহে সবে পরস্পর চাহি,
কোথাও কাহারও বাড়ি নাহি।

মফস্বল শহরে কলিকাতা হইতে নবাগত বাবুদের 'Damn-cheap' বা 'ড্যাঞ্চি' বাবু বলা হয়।

থমথম করে 'হল্'   লক্ষ্মীর নয়নে জল
সভ্যদল ফ্যালফেলি চায়;
নিরাশ্রয় আশ্রয় না পায়।

তখন কে আসে ধীরে ধীরে
বুট পায়ে গান্ধী-টুপি শিরে।
হল্-ঘরে আলো নাহি,   স্তব্ধ সবে দেখে চাহি,
সম্মুখে ফেরারী হাঁদুবাবু।
পশ্চিমে তপন প্রায় কাবু।

লক্ষ্মীর চরণরেণু লয়ে
হাঁদুবাবু কহিল বিনয়ে,
কাঁদে যারা বাড়ি-হারা   আমার ভাড়াটে তারা,
সবাকার বাড়ি মিলাবার
আমি আজ লইলাম ভার।

শুনিয়া বিস্মিত সবে ভাবে,
এত বাড়ি হাঁদু কোথা পাবে?
ম্যাজিস্ট্রেট, মহারাজ   যে কাজে অক্ষম আজ,
লক্ষ্মী সাক্ষী কী কহিল হাঁদু?
ফেরারী কি শিখে এল যাদু ?

হাঁদু কহে নমি সবা কাছে,
শুধু সেই বাড়িখানি আছে—
যে বাড়ি আমার নয়,   তাই সে সবার হয়,
মন্ত্রী ভিক্ষু করে কাড়াকাড়ি,—
গলিপ্রান্তে বিরহিণী বাড়ি।

পাই যদি তোমাদের দয়া
মোর আশা হইবে বিজয়া,
বোম-ভীত স্তম্ভিত যারা   সকলেই পাবে ভাড়া,
সে বাড়ি একশো হয়ে আজ
ঘুচাইবে নগরীর লাজ।

মোহিতলাল মজুমদার

১৮৮৮-১৯৫২

নবরুবাইয়ত্

ঘাট থেকে হাটে চুব্‌ড়ি মাথায়
যেয়ো না, সজনি, যেয়ো না!
মিশি দিয়ে দাঁতে শুধু মুখে সখি,
দোক্তা ও চুন খেয়ো না!
তুমি যে আমার কবিতার বঁধু
বয়সকালের চাক-ভাঙা মধু!—
মৎস্যগন্ধা প্রেয়সী আমার
যেথা-সেথা তুমি ধেয়ো না!
ঘাট থেকে হাটে চুব্‌ড়ি মাথায়
যেয়ো না সজনি যেয়ো না।

বিকালে বসিয়া তোমারই দাওয়ায়
ছোটো কলিকায় ফুঁ দিয়া,
ভুঞ্জিব তব রস-আলাপন,
মাঝে মাঝে শুধু 'হুঁ' দিয়া।
তার পর যবে ও মোর বিরাজী,
ঢেলে দেবে ভাঁড়ে তালের সিরাজী,
কোঁৎ কোঁৎ কোঁৎ ঢক্ ঢক্ ঢক্
পিইব নয়ন মুদিয়া —
তুমিই তখন এই পরানের
উনুন ধরাবে ফুঁ দিয়া।

বড়ো ভালোবাসি সুঁট্‌কি-মাছ আর
পান্তা-ভাতের পোলাও,

নোনা-ইলিশের চাটনির চাট্
বোলাও, পিয়ারী, বোলাও!
ফাঁদি-নথ আর মাকড়ির ছাঁদে
হৃদয় আমার ডুকুরিয়া কাঁদে,
ভির্মি যে যাই, কুলকুচো কালে
গাল দুটি যবে ফোলাও।
তবু ভালোবাসি তোমার হাতের
সুঁট্‌কি মাছের পোলাও।
ওই খাঁদা নাকে নাকছাবি প'রে
কেড়ে নিলে মোর মনটি,
তারই লাগি মুই জাত খোয়ালেম
বদল করিনু কণ্ঠি।
ওর কাছে কোথা লাগে 'কালো তিল',—
তাই গানে মোর এত ভালো মিল,
নাকেরই পীরিত— তাই নাকী সুরে
ভরে তুলি সারা বনটি,
মরি মরি! ওই নাকছাবি তোর
কেড়ে নেয় মোর মনটি!
আর নাহি ভয়, কহিনু নিচয়
যৌবন মোর জেগেছে,
সেই সনাতন সুরের মাতন
শিরদাঁড়াটায় লেগেছে।
পশু-মানুষের সহজ তন্ত্র
হবে আজি মোর সাধন মন্ত্র
পেত্নী-দেবতা ভর করিয়াছে,
ভগবান-ভূত ভেগেছে!
আর নাহি ভয়, কহিনু নিচয়
যৌবন যে গো জেগেছে!

চাহি না আঙুর— শুধু চানাচুর,
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান দুই,—
ঘল্‌ঘসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ বেল যুঁই।
লোকে বলে গানে আঁষ্‌টে গন্ধ,
বোঝে না আমার এমন ছন্দ!—
আর কিছু দিন ইহারই ক্ষুধায়
নাড়ী যে করিবে চুঁইচুঁই!
চাবে না আঙুর, চাবে চানাচুর
চিংড়ির চপ খান দুই!

এসো তবে এসো, সাঁজালের ধোঁয়া
দেয় বুঝি ওই গোয়ালে,
কলসীর রস ভাঁড়ে ঢেলে দাও—
খাল ধরে বুঝি চোয়ালে!
প্রেমনদে মোর এসেছে জোয়ার,
ওগো এসো আর কোরো না খোয়ার—
ভাঁটা পড়ে যাবে, নেশা যে ফুরাবে
এই রাতটুকু পোয়ালে—
সাঁজ হয়ে গেছে, সাঁজালের ধোঁয়া
দেয় বুঝি ওই গোয়ালে!

কালিদাস রায়

১৮৮৮-১৯৭৫

হাসিয়ে দিলে

বাপ্ রে ও রে, বাপ্ রে ও রে, কী হাসিটাই হাসিয়ে দিলে,
গেলাম, গেলাম, তলিয়ে গেলাম, হাসির বানে ভাসিয়ে দিলে।
পেট বুক সব ফাঁপিয়ে দিলে, লিভার পিলে কাঁপিয়ে দিলে,
মলাম, মলাম, হাঁপিয়ে দিলে, মাজার কাপড় ফাঁসিয়ে দিলে।
চায়ের পেয়লা ভাঙল, হোঃ - হোঃ চেয়ার থেকে পড়ব নাকি ?
হি, হি, হা, হা, হাসতে হাসতে দম আটকে মর্‌ব নাকি ?
উল্টে গিয়ে দোয়াত, হা হা, কাপড় জামা ভিজ্‌ল আহা,
আসছে কান্না আর না আর না, হাঁচিয়ে দিলে কাসিয়ে দিলে।
মুখের চুরুট কোথায় গেল ? ধরল আগুন জামায় বুঝি,
চশমা কোথা ? হাঁসপাতালে নিতে হল আমায় বুঝি।
ধর আমায়, হাস্‌ছ যে ভাই, জল পাখা কই ? মূর্ছা বা যাই,
ভ্যাস্তা করে, খাস্তা করে নাড়িভুঁড়ি তাসিয়ে দিলে।

নলিনীকান্ত সরকার

১৮৮৯-১৯৮৪

মোহমুদ্গর

শুন হে ভ্রাতঃ সতর্কবাণী: জীবনে-মরণে লহ সম মানি।
অস্থির পঞ্চক জীবনযাত্রা, নাহিকো ছন্দঃ, নাহিকো মাত্রা।
নলিনীদলগতজলমতিতরলম্ তাবজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
চলি বাজারে প্রত্যহ প্রাতে, শূন্য থলিটি বহি ফিরি বাসাতে।
সস্খলন যাত্রা ট্রামে বাসে, অফিস-গতাগতি ঊর্ধ্বশ্বাসে।
পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
মৎস্যে আত্মা খাঁচাছাড়া, দর শুনি নেত্রে দরদর ধারা।
অদ্য নিরামিষ তথৈব কল্য, ভাগ্যে নাহিক রস মাৎসল্য।
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্। নাস্তি ততঃ সুখলেশসত্যম্।
শৃগালকন্টক বীজবরিষ্ঠ, সর্ষপতৈলে ললাট পিষ্ট।
যব-গম-চূর্ণে প্রস্তরচূর্ণ ঘৃত মাঝে কত কী যে পূর্ণ।
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্ হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
কঙ্করকীর্ণা অন্নস্থালী তদুপরি দাইল পয়ঃপ্রণালী।
বদনে বিঘ্নিত চর্বণশক্তি অশনে খসন্ত দংষ্ট্রাপঙ্‌ক্তি।
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্ দশনবিহীন জাতং তুণ্ডম।
জীবনযাপন বড়োই অসহ্য ভেজালীকৃত ভোজ্যাভোজ্য।
মিথ্যা মায়া খলু সংসারে, মিথ্যা আসা বারে বারে।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদম্প্রবিশাসু বিদিত্বা।
খাইনু আফিম কী করি অগত্যা আপন হাতে আপন হত্যা।
নিষ্ক্রিয় আফিম দেখিনু চাহি, মৃত্যু তো নাই-ই তন্দ্রাও নাহি!
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১৮৯০-১৯৭৫

স্বর্গীয় ফলার

একদা জ্যোৎস্না নিশীথে যখন ঘুমে ছিনু নিমগন,
ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া আমাকে করিলা নিমন্ত্রণ।
কহিলা, 'বাঙালি কবিরা জগতে ভালো নাহি খায় মোটে;
তাই তোমাদের খাওয়াব ফলার, আনিব ভালো যা জোটে।
মিথ্যাবাদীকে মিথ্যুক বলি', তস্করে বলি' চোর
গ্রাম্যভাষায় গালি দিয়ে কেন অপমান করো ঘোর?
তাই তো ধনীর 'নন্দী-ভৃঙ্গী' আঁটিছে ফন্দী খাসা!
উচ্চৈঃশ্রবা ছুটায়ে আমার তাই এত দূরে আসা।'
হেসে বলিলাম, তা বেশ! চলুন! ভট্চায ব্রাহ্মণ!
মধুর বচনে তাহার পিছনে করিলাম আরোহণ।

২

ঘোটক পলকে ছুটিল পুলকে নীহারিকা-পথ ধরি;
নাল-দেওয়া খুরে চোট্ খেয়ে তারা ছিট্কায়ে পড়ে সরি!
বিদ্যুৎ-বেগে শুনি নি কিছুই, কানে লেগেছিল তালা;
বিনি-সুতে গাঁথা দেখিলাম গ্রহ-উপগ্রহের মালা।
এক লহমায় তোরণে পশিয়া আঁখি হল অনিমিখ!
মর্ত্যের মৃত ভণ্ড-সাধুরা স্বর্গে দৌবারিক!
হাম্বড়া ধনী সেথা ঝাড়ুদার, পথে করে ছোটাছুটি;
চিনি অনেকেরে, অতি-সঙ্কোচে কহি নাই মুখ ফুটি।
দলি' কোহিনূর পশিনু বিশাল সোনার প্রাসাদ মাঝে;
কত উর্বশী অপ্সরী সহ ইন্দ্রাণী সেথা রাজে!

৩

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস হাসিয়া ছুটিয়া আসে!
খেয়ে-দেয়ে বেশ মোটা সে হয়েছে, সারদা রয়েছে পাশে।
চট্টল-কবি জীবেন দত্ত আসে মেলি মৃগ-আঁখি;
কহে সত্যেন 'এসো হে বন্ধু, ছন্দ আর কী বাকি?'
কহিলাম আমি, ভাবি দিন যামি, আসলে হল না কিছু!
ভায়া নজরুল ফুটাইছে হুল্, ভয়ে সবে রয় পিছু।
বাঙালি কবিরা অমিল গদ্যে গবিতা লিখিছে সবে;
বিদ্ঘুটে ভাষা, পরদেশী ভাব, ভাবি নি এমন হবে!
প্রবীণ নবীন দুই দলে তবু চলিতেছে ঠেলাঠেলি!
এ কী বিভ্রাট্, কবিসম্রাটে চলে এবে অবহেলি!

৪

ইন্দ্র আসিয়া কন, 'বন্ধুরা, গাত্র তুলুন এবে!
রাত্রি অনেক হয়েছে, আবার, খেতেও সময় নেবে!'
গোলাপজলেতে হাত মুখ ধুয়ে সবে খেতে বসি পরে;
এক ঝাঁক কচি কিশোরী আসিল পরিবেষণের তরে।
স্বর্ণের থালে দিয়ে গেল তারা আগে বগুড়ার চিড়া,
মাতিনু তাদের মুচ্কি হাসিতে, বড় ভালো লাগে ব্রীড়া!
ডাব-জল দিয়ে মাখিলাম ধুয়ে চিক্কণ চিড়াগুলি ;
খাগ্ড়ার খাসা খাগ্ড়াই পেয়ে খেলাম হৃদয় খুলি!
তারপর পাই থালে পাবনার চন্দনচূর দই;
মোরা একসাথে চাহিলাম হেসে — গুড় এনে দাও, সই!

৫

নিতম্বিনীরা কোমর দুলায়ে চলে গেল সুড়্সুড়্;
হাজির করিল গোয়ালন্দের সফেদ্ হাজারী-গুড়।

চিড়ে-দই-খাওয়া হাপুস-হুপুসে তারা চোখে মুখে হাসে;
ছোঁয়াচে হাসিতে লাগিনু হাসিতে, হাসি কে না ভালোবাসে?
মীরকাদিমের পাত্‌ক্ষীর দিল সোনার থালার পাতে,
মাল্‌দহী খাজা এনে সত্বর বিতরিল সাথে সাথে।
কলিগ্রামের দম্‌-মিছরির খেলাম দু-চারখানি;
মেনকা তখন হেসে কহে মোরে, 'এই গ্রাম কোথা, জানি!'
এনে দিল পরে শান্তিপুরের খাসা-মোয়া জনে জনে?
মোয়া থেকে ঘৃত চোয়ায় দেখিয়া বিস্ময় মানি মনে!

৬

জিহ্বা শাণাতে রম্ভা আমাকে দিল নুন আদা-কুচি;
পরে থালে পড়ে তাঁতিবন্দের থালার মতন লুচি।
তারপরে পাই আমরা সবাই জনাইয়ের মনোহরা;
সেই সাথে সাথে মুর্শিদাবাদী লভিলাম ছানাবড়া।
জফরসাহীর খাঁটি ঘিয়ে ভাজা ঢাকাই পরোটা পেয়ে
বড়োবাজারের রাব্‌ড়ি সবাই বারবার নিই চেয়ে।
কোমর-বসন দিলাম খসায়ে, ফেঁসে যায় বুঝি পেট!
সোনার থালাতে পারি নে তাকাতে, মাথা নাহি হয় হেঁট!
খেতে আরো কত রয়েছে খাবার, কেমনে খাব তা ভাবি;
হীরার দেওয়ালে হেলান দিয়ে কী খেতেছি ভীষণ 'খাবি'।

৭

অর্ধঘন্টা বিশ্রাম করি আবার হলাম সোজা;
ঠাসিয়া ঠুসিয়া বসিয়া হাল্‌কা করিনু পেটের বোঝা;
পেলাম এখন বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা;
হুরী পুরী সবে হাসে খিল্‌খিল্‌ যতই করি না মানা!
রাজসাহী থেকে বাদ্‌শার প্রিয় আনীত রাঘবসাই
তিন-চারখানি ঠাসিলাম পেটে, জায়গা যদিও নাই!
পুঁঠিয়ার প্রিয় অম্বিকাখানি ভেঙে মুখে দিই গুঁজি;
নাটোরের কাঁচাগোল্লা গিলিয়া প্রাণে মারা যাই বুঝি!

শচীরাণী এবে মুখ বদ্‌লায়ে জিহ্বা করাতে তাজা,
দিলো ভালোবেসে কৃষ্ণনগরী সর্‌পুরে সরভাজা।

৮

ঈশ্বরদির ছানার জিলাপি, ঢাকার আমৃতি সাথে
রানাঘাটে-গড়া পান্তোয়াগুলি থালে পড়ে রয় রাতে।
মুক্তাগাছার মণ্ডার সাথে টাঙ্গাইলের চম্‌চম্‌
খেতে গিয়ে মাথা ঝিম্‌ঝিম করে দেহ করে ছম্‌ছম্‌!
পেট ঘেটে ওঠে, পারি না বসিতে, উঠিতে চাহিনু সবে;
দেবরাজ ছুটে কাছে এসে কন 'একটু বসিতে হবে!—
বৌবাজারের সন্দেশ কোথা! ওগো, আনো তাড়াতাড়ি!
শীগ্‌গির আনো বাগ্‌বাজারের রসগোল্লার হাঁড়ি!'
আনে সন্দেশ, আনিল গোল্লা, ঠাঁই পেটে নাই মোটে!
রসগোল্লার গুলিতে ভূধর-উদর-কেল্লা টোটে!

৯

অমনি হঠাৎ হল্লা করিয়া উঠিনু আসন ছাড়ি;
চোখের নিদ্রা টুটিল যেমনি, স্বর্গ দিলাম পাড়ি!
ইন্দ্রপুরীর জেল্লা কোথায়? মজিলাম কার তরে?
দেখিনু লালায় ভিজেছে বালিস্‌, ঘুমে ছিনু ভাঙা ঘরে!
তখনও ঊষসী মারিতেছে উঁকি পুব্‌গগনের পাড়ে!
দেখা যায় তার মুখের মাধুরী রূপসী বনানী-আড়ে!
বস্তুজগতে দিবস-স্বপ্নে আমরা উপোসী রহি!
ক্ষ্যাপার মতন উদাসী জীবন, ঘাত-প্রতিঘাত সহি!
তবু এ-জীবন স্বপ্নে শোভন, পেতেছি পুলক প্রাণে!
মাতিয়া রয়েছি স্বপ্নের মাঝে জীবনের জয়গানে!

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১৮৯৪-১৯৬৫

১২ নম্বরে থাকি

তোমার নাম কি সুমিত্রা সেন? এ্যাভিনিউ লেনে থাকো?
আমি নেক্সট্-ডোর-নেবার তোমার সে খবর জানো নাকো?
লজ্জা কী তাতে! এমনি তো হয় শহর কলকাতায়
জানা মুশকিল পাশাপাশি ফ্ল্যাটে কে কখন আসে যায়।
তাতে কী হয়েছে? তোমায় কিন্তু জানি বহুদিন থেকে,
কতবার আমি দেখেছি একেলা বসিয়া থাকিতে লেকে।
সত্যি আমার বিস্ময় লাগে— তোমার মতন মেয়ে
বিষণ্ণ মুখে বসিয়া থাকিবে আকাশের পানে চেয়ে!
ঠিক আকাশের পানে না হলেও, দেখিতে বিশ্রী লাগে।
কে জানে আমার কেন বিস্ময়! কেনই বা ব্যথা জাগে!
তোমার দাদার সঙ্গে পড়েছি, সে এখন রেঙ্গুনে ?
প্র্যাকটিস্ করে? ভালোই করেছে। দিন-কাল দেখে শুনে
মনে হয় পোড়া বাঙলা দেশের আবহাওয়ার থেকে দূরে
যদি থাকা যায়— সেই ভালো। দেখ, সেই যে গোপালপুরে
তোমার মাসিমা মিস্ মিত্তির ছিলেন অনেক দিন,
হার্টের ব্যারাম সেরেছে কি তাঁর? দেশের যে দুর্দিন!
তাঁর মতো মেয়ে লাখে এক মেলে! তুমি গড়া তাঁরই হাতে।
ঘরের ভেতর বেজায় গরম! চল যাই খোলা ছাতে।

টি-পার্টিতে আমি হামেশা আসি না, বড় স্টেল্ মনে হয়,
অতিনম্রতা বিনয়-ভাষণ সে আমার ধাতে নয়।
নমস্কারের রেগুলার রেস্, হঠাৎ দমকা হাসি,
কেতাদোরস্ত ভব্যতা যেন গলায় পরায় ফাঁসী!

সুমি, আজ তুমি চুপ করে কেন? কোথা সে উচ্ছলতা?
কোথা গেল আজ কুমারী নারীর মধুর প্রগল্‌ভতা?
তোমারে দেখিলে মনে হয় তুমি রয়েছ অন্যমনা।
মুখ ভার করে পার্টিতে আসিলে ভাবে কি অন্য জনা?
তোমার বন্ধু ডলি দত্তের মাসতুতো বোন লিলি—
বেনামীতে তিনি লেখেন পদ্য, কথা কন নিরিবিলি,
কান্তিলালের তিনিই ফিঁয়াসী, গর্ব যে তাই নিয়ে,
ক্রিস্‌মাসে নাকি হনিমুন হবে মন্দার হিলে গিয়ে।
কেমনে হল এ মনের মিলন?— একজন ডেনটিস্ট,
মেয়ে একজন কবি- গ্র্যাজুয়েট, বেজায় সোশিয়ালিস্ট।
ক্যাপিটালিস্ট যে কান্তির বাবা! সাতটা চিনির কল।
সেথায় কেমনে খাপ খাবে বল লিলির প্রিন্সিপ্‌ল্?
যাক গে সে কথা; তুমি কি ভেবেছ বাবা-মা নেইকো বলে
কুমারী জীবন কাটাইয়া দিবে কলেজে পড়ার ছলে?
রেঙ্গুনে যদি কালই চিঠি লিখি, আপত্তি কিছু আছে?
দেখ, ছাদময় নানান রঙের ভারবেনা ফুটিয়াছে!
দেখেছ কেমন অঢেল জ্যোৎস্না! হাসিছে পূর্ণশশী।
সঙ্গী পাইলে 'মহুয়া' পড়িয়া রাত্রি কাটাই বসি;
একেবারে তুমি চুপ করে গেলে? বিরক্ত হলে নাকি?
আজ তবে আসি। মনে রেখো, আমি ১২ নম্বরে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

১৮৯৬-১৯৩২

প্রীতি-উপহার

বন্ধুবর মজলিস মিঞা সম্প্রতি কাব্যচর্চা আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া একটি কবিতা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার রচিত ছাপানো একখানা প্রীতি- উপহার (!) পাঠাইয়াছেন। কাহার বিবাহের প্রীতি-উপহার তাহা পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম না, আমূল অবিকল উদ্ধৃত করিয়া ছিলাম।

শ্রীশ্রীহকনাম।

(প্রিতি-উপহার)

খাদেম মৌলবী আলী আহাম্মদ মজলিস কর্ত্তৃক কোনও ইয়ারের বিবাহে বোম্বাই শহরে রচিত

পয়ারে পহেলা বন্দি আল্লা নিরাকার।
দ্বিতীয়ে ছালাম যত ফেরেস্তা তাহার।।
এছরাফিল মেকরাইল আর জেব্রাইল।
সবারে ছালাম দেই আর আজরাইল।।
আল্লার কুদরতে পয়দা সকল জাহান।
আল্লারে ছালাম করি রহিম রহমান।।

(ত্রীপদী)

আল্লা নামে ছুরু করি বিনয়ে কলম ধরি
দোয়া তার যাচিঞা করিয়া।
প্রিতি-উপহার লেখি মনেতে হইয়া সুখী
ছাহেবান খোসাল হও পড়িয়া।।

(পয়ার)

আজি কি রোশনাই হইল বোম্বাই শহরে।
সুখের মিলন হইল মোছলেম কাফেরে।।
জেয়াফতে কত লোক হাজের হইল।
হালুয়া কালিয়া কোর্মা কত যে খাইল।।

খাছীর কাবাব খায় মুর্গীর ছুরুয়া।
কত কত মেওয়া খায় উদর পূরিয়া।।
আজি গুলাবের সাথে মালিনীর মিল।
খোদারে ছালাম করি খুলিলাম দিল।।
হইল মিলন যেন ইছুফ জোলেখা।।
লায়লী মজনু যেমন কিতাবের লিখা।।
শিরি আর ফরহদ য্যায়ছা মিলন।
এমনি হইল মিল কহিনু বর্ণন।।

(ত্রীপদী)

আজি এ চাঁদনী রাতি আছমানে চাঁদের বাতি
কুকিল গাহিছে মধুর স্বরে।
আশক মাশূক দোনো খোসালে পুরিয়া মনো
হাজির হইল দরবারে।।

(পয়ার)

নাচ বাজা রাগরঙ্গ বহুত হইল।
নাজনিন বাঈ কত নাচিতে লাগিল।।
বেহালা ছেতার আর তানপুরা এছরাজ।
তবলা ডুগি ঢাক বাজে নাকাড়া পাখওাজ।।
সারিন্দা বাজিল বিণা বোর্ব্বত ছানাই।
সাদিয়ানা বাজা বাজে কত ঠাঁই ঠাঁই।।
দরবার উজালা হৈল তাহাদের ছুরাতে।
মার্‌হাবা মার্‌হাবা কয় সকল জনেতে।।
কাজী মুফ্‌তী মোল্লা আসে চাপকান আঁটিয়া।
হিন্দু পীর দেওধর পাগড়ী সাঁটিয়া।।
ধুমধাম করি সাদি পড়ান হইল।
দস্তুর মাফিক কাম আঞ্জাম হইল।।
এখন দোনোরে কিছু করি নছিহত।
খোদার দোয়ায় দেল যাক খোছালিত।।

একমনে রও দোনো আশক মাশূক।
খোছহালে চিরকাল নাই পাও দুখ।।
দুলহিনের কই কিছু বিশেষ করিয়া।
মমিনী কানুন কই শুন মন দিয়া।।
ফজরে উঠিয়া বিবী অজু করিবেক।
তারপর ফজরের নেমাজ পড়িবেক।।
তারপর বানাইবে খাসা খাসা খানা।
কোফতা পাকাইবে দিয়া খাছীর গর্দানা।।
অৰ্দ্দেক পিঁয়াজ দিবে অর্দ্দেক রসুন।
ঝাল দিবে ঘিউ দিবে আর দিবে লুন।।
এলাইচ জাফরান দিবে দারচিনি বাঁটা!
আণ্ডার কুসমী দিয়া করিবে লপেটা।।
তারপর আরবার পড়িবে নেমাজ।
তারপর নাস্তা খাএ করিবেক কাজ।।
পাঁচ ওক্ত নেমাজ হররোজ পড়া চাই।
তুমি কাফেরের বেটী এত বলি তাই।।
পাঁচ ওক্ত নেমাজেতে খুছি হয় খোদা।
অধেক পড়িলে পরে ছোয়াব জেয়াদা।।
খছমের পায়ে সদা রাখিবেক মতি।
শবেরাতে মছজেদে দিবে বাপের বাতি।।
বাতি দিলে খুলা হয় বেহেস্তের দরওাজা।
মা বাপ বেহেস্তে যায় নাহি পায় সাজা।।
রোমজান মাসে বিবী রাখিবেক রোজা।
রোজা না রাখিলে বন্ধ বেহেস্তের দরওাজা।।
হজ আর জাকাতেতে রহিবে মজবুদ।
দেলখোছে পড়িবেক দোয়া আর দরূদ।।
শরিয়ত মতো জদি আর তিন জনো।
খছমেতে সাদি করে না হবে পেরসানো।।
আপন বহিনের মতো তিনেরে দেখিবে।
আল্লার রহমৎ এহি মনেতে মানিবে।।

বেটা বেটী পয়দা হইলে শিখাবে তাবিজ।
শিখাবে মছল্লা জত শরিয়ৎ মাফিক।।
জতদিন জেন্দা রবে করিবে নেক্ কাম।
প্রিতি-উপহার লিখা হইল তামাম।।

তামাম শোধ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

১৮৯৯-১৯৭৯

দরদ

যাহারে বেসেছি ভালো, বাসিব রে কিংবা—
আম আতা আনারস, কুল কচু নিম বা
সায়গল, উমাশশী, ডগলাস, ময়না,
হিটলার, হরিজন, গারবো বা গয়না,
ভাটিয়া, ইহুদী, আগা, মাড়োয়ারি, পার্শি,
ভিটামিন, সোভিয়েট, চশমা বা আরশি,
লাল পানি, তামাক, চা, মোদক বা গাঞ্জা,
কিশোরী, যুবতী, বুড়ি, পতিহীনা, বাঞ্জা,
টু-সীটার, পুলোভার, ডিম, কিমা, নিম্‌কি,
সুভাষ, সাপ্রু, রবি, শিশির বা সিম্‌কি;
বাছুর, ছাগল, ভেড়া, চার্লি বা মার্লেন;
জি. বি. এস., কুপরিন, বুনিন বা আরলেন;
ট্যাক্সি, ফোন বা লেক, ক্যামেরা বা তুলি গো,
ভাইঝি, বৌদি, মাসী, ভাগিনী, মাতুলী গো;
করপোরেশন, রেস্, বীমা আর মাসিকে,
কংগ্রেস, রায়বেঁশে, সেতার বা বাঁশিকে,
ফ্রয়েড্ আর ভেরোনফ্, co-ed বা কুল্‌পি,
স্বরাজ, বেতার-বাণী, গজল বা জুলফি,
শাঁসালো শ্বশুর, শালী, প্রেয়সীর ওষ্ঠ,
সাঁতারু, বিমান-বীর, নাইডু বা গোষ্ঠ,
খাদি বা টুইল মুগা, আদ্দি গরদ গো—
সকলেরই তরে মোর গভীর দরদ গো;
কান ধরে ওঠ-বোস করাইছে নিয়ত
উদ্ধার যদি থাকে বাতলায়ে দিয়ো তো।

বিবাহের ব্যাকরণ

নববধূ এলেন বটে চেপে রুপার পালকি,
ঘরে কিন্তু নেই ঠিকানা খাবেন তিনি কাল কী!
মেয়ের বাপের রক্ত চুষে বাজল বটে বাদ্য,
ঘরে কিন্তু নেইকো রে হায় পেটে দেবার খাদ্য!
খাবেন কী তা ঠিক না হতেই এলেন একটি পুত্র,
সফল হল সংস্কৃতের অসাধারণ সূত্র।
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজল ঠনন্ ঠঙ
'বি'-পূর্বক 'বহ' ধাতু, তার উত্তর 'ঘঞ'।

প্রথম যখন এলেন বধূ দেহভরা লজ্জা,
আলতা-পরা পা দুখানি, রাঙা রাঙা সজ্জা,
চুপিচুপি বলেন কথা, মাথায় আছে ঘোম্‌টা,
সার করেছেন লাজের চোটে আঁধার ঘরের কোণটা!
কিন্তু যখন দু দিন পরে বাহির হল অগ্নি,
বল্লেন হেঁকে, 'তাড়াও পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী।'
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজল ঠনন্ ঠঙ
'বি'-পূর্বক 'বহ' ধাতু, তার উত্তর 'ঘঞ'।

স্বামী মশায় লেখাপড়া শিখেছিলেন উচ্চ,
পুচ্ছ 'পরে ছিল তাঁহার উপাধিরও গুচ্ছ।
বধূ গেলে বাপের বাড়ি বিরহেতে সদ্য
লিখে ফেল্লেন চিঠি একটা মস্ত বড়ো পদ্য!
কিন্তু তাহার আঁকাবাঁকা এইসা এল উত্তর
যে রাগের চোটে স্বামী মশায় বলে উঠলেন 'দুত্তোর!'

ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজল ঠনন্ ঠঙ
'বি'-পূর্বক 'বহ্' ধাতু, তার উত্তর 'ঘঞ'!

এমনি করে, সুখে দুখে গেল কয়েক বর্ষ,
স্বামীর হল 'ম্যালেরিয়া' 'বহুমূত্র' 'অর্শ'।
ক্রমাগত ছেলে হয়ে বধূ হলেন রুগ্ন,
দেহলতা হয়ে গেল কাঠির মতো শুকনো।
একদিন হঠাৎ মরেও গেলেন ছেড়ে এ ঘরকন্না,
ঘটক মশাই নতুন করে দিলেন আবার ধন্না!
ব্যাকরণের চাঁছা গলায় বাজল ঠনন্ ঠঙ
'বি'-পূর্বক 'বহ্' ধাতু, তার উত্তর 'ঘঞ'।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৯-১৯৭০

হরি হরি

গৃহিণী ঘুমান শয্যায় হয়ে কাত
চুলের তলায় এলায়ে শিথিল হাত—
ভাবি, আহা মরি মরি!
জেগে উঠে কন— 'গরমে প্রাণটা যায়
দুজন কি শোয়া চলে এক বিছানায়!'
শ্রী বিষ্ণু হরি হরি।
সকাল বেলায় মেছুনি গয়লা সাথে
তর্ক করেন দৃপ্ত ভঙ্গিমাতে—
ভাবি, আহা মরি মরি!
খেতে বসে শুনি, উদাস কণ্ঠে কন—
দুধ ও মাছের হয় নাই আয়োজন!
শ্রী বিষ্ণু হরি হরি।
তরুণ ঘোষের সাথে যবে কন কথা,
কী হাসি রঙ্গ! কটাক্ষ চপলতা!
ভাবি, আহা মরি মরি!
পালা ভেঙে যায় যখন সে যায় চলি,
গম্ভীর মুখে পড়েন 'গীতাঞ্জলি'!
শ্রী বিষ্ণু হরি হরি।
নূতন শাড়িটি অঙ্গে জড়ায়ে পরি'
ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখান বাখান করি'—
ভাবি, আহা মরি মরি!
দোকানদারের বিল্ যবে দেয় হানা
একশো সাতাশ টাকা ও এগারো আনা!
শ্রী বিষ্ণু হরি হরি।

আয়নায় আঁখি রাখিয়া বাঁধেন চুল
কবরী ঘিরিয়া জড়ান অশোক ফুল,
ভাবি, আহা মরি মরি!
মোরে কন, আমি চললাম সিনেমায়
নেমন্তন্য করেছে অশোক রায়—
শ্রী বিষ্ণু হরি হরি।
মাসের পয়লা মাহিনা পাইলে, উনি
সলীল ভঙ্গে হাসিমুখে নেন গুনি
ভাবি, আহা মরি মরি!
সে টাকাগুলির কড়া-ক্রান্তি আর
দেখিতে পাই না নাগাদ মাসকাবার—
শ্রী বিষ্ণু হরি হরি।
পঞ্চশরের উত্তাপে দ্রব হিয়া
বিগলিত হয়ে করে যবে পিয়া পিয়া—
ভাবি, আহা মরি মরি!
কাছে যাই; তিনি বিরস কণ্ঠে চাপা
য়াহা কন, তাহা কাগজে যায় না ছাপা—
শ্রী বিষ্ণু হরি হরি।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৮৯৯-১৯৭৬

প্যাক্ট্

বদ্‌না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

আঁটসাঁট ক'রে গাঁটছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে।
একজন যেতে চাহিরে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে ॥

বুকে বুকে মিল হল নাকো, মিল হল পিঠে পিঠে? তাই সই!
মিঞা কন, 'কোথা দাদা মোর?' আর বাবু কন, 'মিঞা ভাই কই?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়-চোখাচোখি, কী মধু মিলন হইল!

বাবু কন, 'খাই তোমারে তুষিতে ঐ নিষিদ্ধ কুঁক্‌ড়ো!'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো টুক্‌রো।
বাদশাহী গেছে, আছিল মুরগী, দাদা, তাও হল শুদ্ধি?
দরমা খুলিয়া তাও নিয়ে গেলে, আর কার জোরে যুদ্ধি!'

বাবু কন, 'পরি লুঙি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে।'
মিঞা কন, 'ফেজে রাখি চৈতনী ঝাণ্ডা সেই সে খুশিতে!
আমাদের কত মিঞা ভাই করে বাস তব বারাণসীতে,
(আর) বাত হলে মোরা ভাত খাই নাকো আজও তাই একাদশীতে।'

বাবু কন, 'মোরা চটিকা ছাড়িয়া সেলিমী নাগ্‌রা ধরেছি।'
মিঞা কন, 'গরু জবাই-এর পাপ হতে তাই দাদা ত'রেছি।'

বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি ছেড়ে দাও খাওয়া বড়োটা।'
মিঞা কন, 'দাদা, মুরগী তো নাই, কী দিয়া খাইব পরোটা!'
বাবু কন, 'গোরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে তোরে মন্দিরে নিয়া যাই!'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞার ঘরে নাহি লহ হরিনাম,
বলদ সহিত ছাড়িব তোমারে যাহা হয় হবে পরিণাম!'

'সারা-রারা-রারা' সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা,
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছোর্‌রা!
লাগে টানাটানি হেঁইয়ো হেঁইয়ো, টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি, নব-প্যাক্টেরই পুণ্যে!

বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি, রোল উঠিল 'হা হন্ত!'
ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত!
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা— করুণ চন্দ্রবিন্দু!

জীবনানন্দ দাশ

১৮৯৯-১৯৫৪

সুবিনয় মুস্তফী

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।
এক সাথে বেড়াল ও বেড়ালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার।
ইঁদুরকে খেতে খেতে সাদা বেড়ালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হতে হতে সেই ভারিক্কে ইঁদুর
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তারা দুই জনে কতখানি দূর
ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচকা মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছুদিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা করে দিতে যেত — মাটির দরের মতো রেটে;
তবুও বেদম হেসে খিল ধরে যেত বলে বেড়ালের পেটে
ইঁদুর 'হুর্‌রে' বলে হেসে খুন হত সেই খিল কেটে-কেটে।

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হল মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল— রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে;
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।
তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরী মিলে গিয়ে
গোল হয়ে ব'সে গেল তিন মগ চায়ে;

একটি উজির, রাজা, বাকিটি কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিল বাৎলায়ে।
তবু এক ভিখিরিণী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলে মিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যাণ্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার করে নিতে গেল সোঁদা ফুট্‌পাতে ব'সে;
মাথা নেড়ে দুঃখ ক'রে ব'লে গেল: 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কি হত জাঁহাবাজ?
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র বৌ সকলে নারাজ।'

ব'লে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিল এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাকচুন্নীকে।
এ মেয়েটি হাঁস ছিল একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার করে দিল তাকে আরেক গেলাস:
'আমাদের সোনা রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?

এ সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়;
নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেন্টিক্‌ স্ট্রিটে
তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়;
চুলের এঁটিলি মেরে গুণে গেল্‌ অন্যায় ন্যায়;
কোথায় ব্যয়িত হয়— কারা করে ব্যয়;
কী কী দেয়া থোয়া হয়— কারা কাকে দেয়?

কী করে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়— বিনি দামে — তবে কার লাভ,—
এই নিয়ে চারজনে করে গেল ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দেখে— যতদিন মুখ দেখা চলে।

সজনীকান্ত দাস

১৯০০-১৯৬২

চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর

আগুন লেগেছে বাগুনের ক্ষেতে, বুঝি ফাগুনের গুণে।
উনায়ে উনুন নুন দিল কে বা, ঘুণ ধরে গেল চূণে।
ডুমো গালে চুমো খেতে ঘুম দিল খোকা পথদ্রুম পাশে,
লুচিমুখো মুচি কাঁচা আমকুচি খেয়ে মুখ মুছি হাসে।
চাঁদের ফাঁদেতে বাঁধা প'ড়ে খাঁদা লোকে চাঁদা করি কাঁদে,
বাঁধে বাঁধে লোক চলে নানা ছাঁদে গামছা ফেলিয়া কাঁধে
ভূর্জপত্রে হায়—
কে পাঠল লিপি, সূর্যের বুকে তূর্য কি শোনা যায়!

গুর্জরে আজ খর্জুর বনে দুর্জয় হল কে—
লোপ করি গোঁফ, বিলাতি কলপ লেপি লোল অলকে!
বৃষ্টি পড়িছে, সৃষ্টিছাড়ারা 'কৃষ্টি'র লাগি কৃশ।
দৃশদ্‌বতীর তীরে ম্রিয়মাণ দাঁড়ায়ে তৃষিত বৃষ।
হায় রে গ্রহের ফের—
হৃদ্য তা দিয়ে কে বোজাবে আজ ছিদ্র দারিদ্র্যের?

মুক্তার লাগি চুক্তি করিয়া শুক্তি তুলিনু তীরে,
মৌরীবনেতে গৌরী বধূর কৌড়ি হারাল কি রে!
জ্বরে জরোজরো বজরায় ফিরি নজরা হানিয়া ঘাটে,
হৃদয়-দরজা প্রিয়াপদরজ না লাগি বুঝি বা ফাটে!
ঠা ঠা-পড়া রোদে তাই
চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর, ঢাকাই পরোটা খাই।

সোনার পাথরবাটি

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা'—
বারি নাই এক বিন্দু, তবু পূর্ণ ঘড়া!
মন নাই, মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি,
মাথা নাই, মগজের বহরেতে মরি।
পৌরুষ নাহিক তবু দর্প পুরুষের,
বিদ্যা নাই পেটে তবু ফোয়ারা বাক্যের
নিত্য উৎসারিত হয় হাটে মাঠে ঘাটে
যে গোরু দেয় না দুধ, মরি তার চাটে,—
হায় রে!
হায় রে!
বুলির বহরে হয় খুলির বহর—
মায়ের কণ্ঠেতে শোনে বচনলহর।
মালার ওজনে মা-র অস্তিত্ব বিকল
বাক্য তত বাড়ে যত বাড়িছে শিকল।
ইংরেজ পঞ্জাবী উড়ে কাবুলী গুজরাটী,
কাচ্ছি মাড়োয়ারী পারসী আগুলিছে ঘাঁটি,
খাঁটি মাটি, মূলধন হয়ে এল ফাঁক
শুনিতে উত্তম-লাগে মগজের জাঁক—
হায় রে!
হায় রে!
যে গুটি পাকিল, আধা কাঁচিয়া তা যায়।
ধর্ম এসে ঠেকিয়াছে গোবর-ন্যাতায়!
বোমা কেঁচে হল কালীপূজার আতস,
জেলে গিয়ে বিদ্রোহীর লাগিছে ধাধস!
পূজার মণ্ডপ হল গাঁজার আসর
রাষ্ট্রে ধর্মে ক্ষেত্তি হাবি জাগিছে বাসর।

পড়িছে দশের পিঠে বেটনের গুঁতা
হোটেলে বোতল শুঁকে নেতাদের ছুতা—
হায় রে!
হায় রে!
যাহারা তুলিবে মাথা— কাঁদিয়া ভাসায়,
জাগিবে যাহারা, তারা কাদায় লুটায়।
যাহারা করিবে কাজ, শিবনেত্র তারা,
ফিরিছে বুকেতে লয়ে বিরহ-সাহারা।
মা-র নামে যে দাঁড়াবে সতেজ নির্ভীক—
কামাতুর হয়ে দেখি ফেরে দশ দিক।
যাহারা আপন পায়ে দাঁড়াবে সবলে,
তাহারা মরিছে ধুঁকে কীটের কবলে—
হায় রে!

গাণ্ডীবী

গাণ্ডীবী, গণ্ডার চেনো? খাণ্ডবের পাণ্ডুর গণ্ডার?
কপিশ ক্রন্দন তার ধ্বনিতেছে উৎক্রান্ত অম্বরে।
বৎসহারা বসন্তের প্রজননে শিলীন্ধ্রসঙ্কুল
জাতিস্মর বিস্মাপনে নির্বীজিত শুনেছ কি তুমি?
প্রৌঢ়প্যাঁচপ্রপঞ্চিত প্রভবিষ্ণু যশের জিলেপি
প্রাক্কালিক প্রাজনের প্রতাড়নে প্রচণ্ড প্রসব,
গণ্ডোফেরাসের কিম্বা কাসাণ্ড্রার ধূসর কঙ্কাল
কৃকলাস অতিমর্ত্য ক্যানোপাস পাপ দেখেছ কি?
আসমুদ্র বিজৃম্ভনে পুষ্কারিছে ঘটোৎকচ প্রেম,
দেখেছ কি তুমি তার মৃত্যুম্লান মাতরিশ্বাদ্যুতি?
দৈনন্দিন আঞ্জুমানে বালখিল্য আনন্দের ব্যূহ
মার্জারীর গর্ভস্রাব ক্লেদরক্তে করে সঞ্চরণ
মহোৎসাহে মৎস্যসম, অগামারা অলজ্জ অন্যায়
উল্লসিত মুক্তনীবি পৃথিবীর অন্তিম আকৃতি

অট্টহাস্যে উন্মুখর সিসৃথু শ্রীপদে বিস্ফোটক
দেখেছ কি কুম্ভকর্ণে কুম্ভীপাকে হতে কুপোকাত?
বেপথু বল্লরীসম ধ্যানস্তব্ধ হিপোপটেমাস
ক্রন্দসী অটবীবক্ষে গতক্লম ব্যূঢ়োরস্ক স্তন,
ছিন্নচ্ছদ আপিঙ্গল এরণ্ডের পুষ্প অনার্তবা!
মৌসুমী মাস্তুলে দোলে ফ্যাকফেকে ধূসর বাতাসে
মন্থর নিরন্ন নোংরা শুদ্ধোদন উচ্ছল পূর্ণিমা,
নীলকণ্ঠী পুঁইশাকে উপোসী কুঞ্চিত কুব্জদেহ
অসির ঝঞ্ঝনা! পার্থ, তুমি অতি ইডিয়ট ছিলে!
স্যাঁৎসেঁতে ছাতাপড়া নোনাধরা দ্রৌপদীরে তুমি
বেঁধেছিলে উল্কার আশ্লেষে; আঁস্তাকুড়ে ছিল না কি
মরা ইঁদুরের ছানা, স্ফটিকের ছলনার মতো
নিঃঝুম নিঃশেষ জুতো! ব্যর্থজন্ম ধিক্ তব ধিক্!
শুধু কুরুক্ষেত্র মাঠে খণ্ড খণ্ড ইতর গুণ্ডামি
ক'রে গেলে গণ্ডমূর্খ! ব্রহ্মাণ্ডের তপ্ত ওমলেট
লালসার লালাস্নিগ্ধ খাও নি তো দিনেক বসিয়া
জ্বলন্ত তৃষায়! হায়, শ্বেতমৃত্যুসম সবিনয়ে
দাও নি তো হামাগুড়ি অন্ধকার করুণ কাগজে
মেনী বাছুরের মতো — অবিশ্বাস্য মসৃণ হাতুড়ি
দেয় নি বিষাক্ত ব্যথা বাদামী মাংসের মতো নীল
যে নগ্ন নির্জন হাত কাঁপিতেছে রোমশ উচ্ছ্বাসে,
বিকলাঙ্গ পিন্দেমন্তে বেয়াত্রিচে ছাড়িছে হুঙ্কার,
দেখ নি তাদের প্রেম, নরম রাতের চূর্ণ প্রেম?
স্নায়ুশিরা সুষুম্নায় মঞ্জুল শিঞ্জিনী আন্দোলিয়া
হৈমন্তিকী শাশুড়ীরে করে নি তো প্রিয়া পরকীয়া?
শ্রান্ত সরীসৃপগন্ধী লিকলিকে, লিপ্‌স্টিক মাখা
রক্তাধর বিচুম্বনে বীর্য নয়, ট্যাঁকে চাই টাকা,
আর ফাটা ফুসফুসে ক্ষুরধার জিলেপির প্যাঁচ!
দুত্তোর! কী হবে কহ ছাতুখোরে তত্ত্বকথা কহি?
গাণ্ডীবী, গণ্ডার তুমি, মরো গে খাণ্ডব বন দহি।

প্রমথনাথ বিশী

১৯০১-১৯৮৬

বর্ষফল ১৩৬০ : হরপার্বতী সংবাদ

হর প্রতি হৈমবতী সসঙ্কোচে কন।
শুভ বর্ষ ফলাফল করহ কথন ।।
কে বা রাজা কে বা মন্ত্রী কে বা কোট্টপাল।
কোন্ গোষ্ঠে কে বা হৈল কাহার রাখাল ।।
শ্বেতরাজ্য, রক্তরাজ্য, পীতরাজ্য আছে।
শুনিয়াছি এই মতো নন্দী-ভৃঙ্গী কাছে।।
কে জন্মিল কে মরিল কেই বা রহিল।
কে মারিল সুকৌশলে কাহার তবিল ।।
এই সব গূঢ় তত্ত্ব জানিতে অন্তর।
হয়েছে ব্যাকুল অতি শোনো মহেশ্বর ।।
এত শুনি মহাদেব বলে হরপ্রিয়া।
শোনো বর্ষফলাফল হরিষ হইয়া ।।
পৃথিবীতে অবতরি তেরশত ষাট।
নূতন প্রভাতে আজি খুলেছে কপাট ।।
শ্বেতরাজ্যে এইবার 'রাজা' হবে 'রানী'।
ব্যাকরণ অভিধান কিছুই না মানি ।।
রক্তরাজ্যে পিতৃহীন সন্তানের দল।
পিতার অভাবে প্রায় হইবে পাগল ।।
কী করিতে কী করিবে কিছু নাহি ঠিক।
বুকে করাঘাত করি কাঁপাইবে দিক।।
পীতরাজ্যে এইবার আছে সুখযোগ।
চিয়াং শাসিত দ্বীপে হইবে দুর্ভোগ ।।
জম্বুদ্বীপে আছে যত কর্তাভজা দল।
কর্তার না বুঝি মর্ম হইবে বিহ্বল ।।

এক বাক্যে আর অর্থ করিবে তাহারা।
ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে কর্তা দিবে তাড়া ॥
বিশ্ব জুড়ে নামিবেক শান্তির বাদল ॥
হাবুডুবু খাবে সবে হয়ে গলাজল ॥
আরও আশ্চর্য কথা শোনো হরপ্রিয়া।
হইবে প্রচুর ধান্য বর্ষণ হইয়া ॥
তাহাতেও অনেকের হবে অসন্তোষ।
বলিবেক এ প্রাচুর্য সরকারের দোষ ॥
ধন ধান্য বেশি হবে এ কেমন ধারা।
তা হলে যে রাজনীতি মাঠে যাবে মারা ॥
আরো আছে গুহ্য বার্তা বিষম বিস্ময়।
জন্মিবে কতক লোক জানিহ নিশ্চয় ॥
তার মধ্যে কিছু ধলা কিছু হবে কালো।
কারও হবে মাথা চ্যাপ্টা কাহারও গোলালো ॥
জন্মিবে যেমন লোক মরিবে কতক।
পাকা আম মিষ্ট হবে কাঁচা হবে টক॥
উড়িবে আকাশে পাখি জন্তুরা হাঁটিবে।
কী আশ্চর্য জলাশয়ে মৎস্য সাঁতারিবে ॥
ছেলেরা কাঁদিবে আর বুড়োরা কাসিবে।
রাত্রিকালে জননীরা মশক নাশিবে ॥
সকল দেশের মধ্যে বঙ্গদেশ সেরা।
নিদ্রা দিয়ে তৈরি সে যে স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা ॥
সরল শিশুর মতো এ দেশের বৃদ্ধ।
বালকে বৃদ্ধের মতো প্রায় বাক্‌সিদ্ধ ॥
বালকেরা বক্তা হেথা বৃদ্ধজন শ্রোতা।
এ দেশের বর্ষফল শোনো গিরিসুতা ॥
এতটুকু দেশ তার এত বড়ো মাথা।
ত্রিধা ভঙ্গ বঙ্গদেশে পুরী কলিকাতা ॥
বিধান সভায় হেতা চলিবেক গোল।
অধিকাংশ সভ্য দিবে গোলে হরিবোল ॥

গণ্ডায় মিলাবে 'আণ্ডা' যত মহারথী।
অতি বৃদ্ধ কারও কারও হবে ভীমরথী ।।
মনুমেন্ট বেচারীর না মিলিবে স্বস্তি।
পাদদেশে নিত্য হবে বাগ্মিতার কুস্তি ।।
পাকিস্তান দিবে পাট বঙ্গ দিবে কয়লা।
দুধে জল আরো বেশি দিবে বুড়ো গয়লা ।।
মাঝে মাঝে কিল খাবে টিকিট চেকার।
সংখ্যায় যাইবে বেড়ে দেশের বেকার ।।
সংবাদপত্রের যত বাড়িবেক কাটতি।
অন্য সব ব্যবসায়ে চলিবেক ঘাটতি।।
মোট কথা বাঙ্গালিরা থাকিবে তেমন।
তেরশত উনষাটে আছিল যেমন ।।
এ বছরে হইবেক ঠিক বারো মাস।
আশ্বিনে না হবে দোল, ফাগুনে না রাস ।।
সপ্তাহেতে সাত দিন হইবেক প্রিয়া।
দিনেতে চব্বিশ দণ্ড লইয়ো গুনিয়া ।।
শুভ বর্ষ ফলাফল শুনিলে যা সতী।
অন্তরে রাখিয়া দিয়ো সঙ্গোপনে অতি।।
নন্দী-ভৃঙ্গী মুখে তুমি শুনিয়াছ সার।
কমলাকান্তের মুখে শুনিলে আবার ।।
ইহাতেও দিব্যচক্ষু নাহি যদি ফোটে।
তোমাতে শিখাতে পারি বুদ্ধি নাই ঘটে ।।
বোঝো আর নাই বোঝো করিয়ো না ফাঁস।
অন্যথায় বিশ্বময় দেখা দিবে ত্রাস ।।

অমিয় চক্রবর্তী

১৯০১-১৯৮৬

নাগরদোলা

চার পয়সার নাগরদোলা কে দুলিবি আয়,
ঘোরায় মেলার কর্তা, ভুবনডাঙায়।
ভুবনডাঙা তো ঘোরে, ঘোরে বোলপুর,
বীরভূমি বীর ঘোরে— আরো লাগে ঘুর,
চার পয়সার কলে ছোটে আস্ত গোটা-গোটা
আংলা বাংলা ধরাধাম, ছেঁড়ে বুঝি বোঁটা
ন্যুটনী আপেল, ঘোরে ছাতাসুদ্ধ মাথা।
হের পৃথ্বী চারিপাশে সারি-সারি পাতা
তারা উল্কা চাঁদ সূয্যি : মাথা ঘোরা বাড়ে
সূর্যের শহর ঘোরে, হ্বেগা-গ্রহের ধারে।
হ্বেগা-সুদ্ধ জ্যোতির্গুচ্ছ আরো ঘোরে কার
কাল-শূন্য আইনস্টাইনী শূন্যে একাকার।
ভির্মি-লাগা রক্তে নাচে স্বপ্ন দোলাদুলি,
ধকো-ধকো অণু ঘোরে শুনি বক্ষে বুলি।
আমার ঘোরা তো হল, যাই এবে কোথা?
ভুলে গেছি ঘর বাড়ি। পালা শেষ। হোথা
তুমি ওঠো, রামু বন্টু তোদের সময় :
ধম্মের লাটিম ঘোরে শাস্তরে তাই কয়।
সেলাম মেলার ঠাকুর।।

পাগলা জগাইয়ের গান

'স্পষ্ট বেসুরে একা ব'সে গান গাই
ক্ষুব্ধ তানসেনি তানে তা-না-না-না,

কেননা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই
(তোমরাও দেখো, নয় তো চক্ষু কানা)
গানের বক্তব্য প্রধানত আজ
চতুর্দিকের সঙ্গে বিদ্রোহ;
পুরোনো সাম্রাজ্যের বরকন্দাজ
যখন নূতন মন্ত্রীর সমারোহ
স্বাধীন স্বদেশের বুকে গুলি চালিয়ে
বাদামী ধনিকের তন্ত্রে রাখে বজায়,
একটু স'রে এসে (দূরে পালিয়ে)
খানিকক্ষণ অন্তত থাকি মজায়;
প্রসিদ্ধ ঘরানা এখনও আছে জানা
তাই দিয়ে গাই তা-না, না, না ॥

'ত্যাগরাজ বা নতুন যদু ভট্টের
শাক্‌রেৎ না হয়েও ক্লিষ্ট প্রাণে
যেটুকু ঠাট আছে তাতে শাঠ্যের
উত্তর দিতে পারি খরতানে।
যদিও কণ্ঠ যায় ভির্মিতে শুকিয়ে
ভাঙা বাংলার কথা ভেবে-ভেবে;
সীমান্তের নদী পেরিয়ে রোজ লুকিয়ে
পাসপোর্ট-হারা দল আসে নেবে,
স্টীমারে রাস্তায় হা-ঘরে হয় মরে,
নয় কলকাতার শান-বাঁধা ফুটপাথে
অন্তিম অধিবাসী ঘুরে পড়ে
মোটর-বিলাসীর আস্তানাতে—
তখন কালো-বাজারির রক্তচোখ দিলে হানা
নির্লজ্জে গাই তা-না-না-না ॥

'যে-আশ্চর্য দেশে সুখনীল শরতে
আপনিই সানাই বাজে আকাশে

তারই শুকনো মাটিতে, শূন্যের পরতে-পরতে
ভিখারীর কান্না জাগে বাতাসে।
ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল একদিকে
অন্যত্র দেখ কালীঘাট :
রুচির ধর্মের লুপ্তি নাও শিখে
স্বয়ং স্বর্গীয় বুকে কবাট।
অথচ কোটি লোক তারই মধ্যে হাঁটে
একটিও কথা কয় না বিরোধে,
ধার্মিক তিলক কাটে ললাটে
অধার্মিক এড়িয়ে চক্ষু মোদে;
বলির নরত্ব-বধ চলেছে একটানা
উর্ধ্বে তাই মাথা নেড়ে বলি তানানানা॥

'এমন সময় যারা স্বভাবত
রচত কবি-গান, দোঁহা, হেঁয়ালি
নিতান্ত অস্তিত্ব সুখের অভাবত
নিবেছে তাদের বাক্য-দেয়ালি।
ময়নামতীর সেই দূর কাহিনী
নব্যের ঘরে-ঘরে ফিরে মেশানো,
বৈদিকে আধুনিকে প্রাণবাহিনী
সুফি-বৈষ্ণবী গেঁথে মন নেশানো
ছিল আমাদেরও গান-বাঁধা দখলে;
নতুন দুনিয়ায় আলো নিয়ে বাঁচি,
তবু ভাঙা তবলা বাজিয়ে দেখ সকলে
মরিয়া হয়ে জানাই বেঁচে আছি—
অন্তত সামনে এলে দৈবজ্ঞ জাত-মানা
তুড়ি দিয়ে গাই তা-না, তা-না-না-না॥

'তারও বেশি, দল বাঁধতে নাচতে জানি,
—মূর্ছার রাজ্য পেরোই কিংবদন্তী;

চীন-পশ্চিম-আফ্রিকার তাজা বাণী
দ্রিম-দ্রিম বাজাই বৈজয়ন্তী—
গান্ধির শান্তি-অক্ষৌহিণী মন্ত্রে
রুখি বোমার দুর্বল উপাসক,
অখণ্ড হিন্দ্-পাকিস্তানি যোগ তন্ত্রে
ঠেকাই সাম্প্রদায়ী ভিন্নের পোষক।
এসো যোগ দাও জগাইয়ের যাত্রায়
আউল বাউল কীর্তনী কোরানী
নরোত্তম পালায় মাতো অতি মাত্রায়
মূর্খ ভক্তের মাথা ঘোরানি—
জাগিয়ে পাড়া জগা পাড়ি দেবে অঠিকানা
ততক্ষণ ঠারে ঠোরে গায়— না— তা, না— তা, তানানানা ।।

বোমারুর আশ্বাস

এক হাতে ওর গাজর আছে, আরেক হাতে বোমা—
গাধার বাচ্চা চমকে বলে, ও মা!
(ধনপতির রঙ্গ দেখে ভয়ে ভয়ে হাসে)
(গণপতির চোখে চাবুক, চাতুরি আশ্বাসে)
(রণপতির বিশ্বনেশা ঘিরল ভুবন ত্রাসে)
গাধার অত বুদ্ধি তো নেই। কী হল জানো, মা?
অতিবুদ্ধির ব্যাপার দেখে প্রায় হল তার কোমা।
(জঙ্গল পালিয়ে বাঁচে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে)
গরিব মানুষ, মাঠের মানুষ, বোঝো এই উপমা ।।

সুনির্মল বসু

১৯০২-১৯৫৭

সাইকেলে বিপদ

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং! সবে সরে যাও-না,
চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাও না?
ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত;
পথ-মাঝে রবে পড়ে ছিরকুটে দন্ত।

বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল—
'যেয়ো না যেয়ো না সেথা, যেথা চলে সাইকেল।'
তাই আমি বলিতেছি তোমাদের স্পষ্ট—
মিছে কেন চাপা পড়ে পাবে খালি কষ্ট?

ভালো যদি চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়া,—
কী লাভ হইবে বল অকালেতে মরিয়া?
সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে—
গালি দিবে চাষা ডোম মুচি তেলি কামারে।

এত আমি বলিতেছি—ওরে পাজি রাস্‌কেল—
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল?
রঘুনাথ একদিন না-সরার ফলেতে
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে।

সতেরই বৈশাখ— রবিবার দিন সে—
চাপা পড়ে মরেছিল বুড়ো এক মিন্‌সে।
তাই আমি বলিতেছি— পালা না রে এখনই,
বাঙালি হয়েছ বাপু, পলায়ন শেখ নি?

মনীশ ঘটক

১৯০২-১৯৭৯

কুড়ানি

১

স্ফীত নাসারন্ধ্র, দুটি ঠোঁট ফোলে রোষে,
নয়নে আগুন ঝলে। তর্জিলা আক্রোশে
অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া,
'খাট্টাইশ, বাঁন্দর, তরে করুম না বিয়া।'
এর চেয়ে মর্মান্তিক গুরুদণ্ডভার
সেদিন অতীত ছিল ধ্যানধারণার।
কুড়ানি তাহার নাম, দু চোখ ডাগর
এলোকেশ মুঠে ধরি, দিলাম থাপড়।
রহিল উদ্গত অশ্রু স্থির অচঞ্চল,
পড়িল না এক ফোঁটা। বাজাইয়া মল
যায় চলি; স্বগত, সক্ষোভে কহিলাম
'যা গিয়া! একাই খামু জাম, সব্রি-আম।'
গলিতাশ্রু হাস্যমুখী কহে হাত ধরি,
'তরে বুঝি কই নাই? আমিও বান্দরী!'

২

পঞ্চদশী গৌরী আজ, দিঠিতে তাহার
নেমেছে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার।
অনভ্যস্ত সমুদ্ধত লাবণি প্রকাশে
বিপর্যস্তদেহা তন্বী; অধরোষ্ঠ পাশে
রহস্যে কৌতুকে মেশা হাসির আবীর
সুদূর করেছে তারে— করেছে নিবিড়!

সান্নিধ্য সুদুর্লভ, তবুও সদাই
এ ছুতা ও ছুতা করি বিক্ষোভ মেটাই।
গাছের ডালেতে মাখি কাঁঠালের আঠা,
কখনও-সখনও ধরি শালিখ টিয়াটা।
কুড়ানিকে দিতে গেলে করে প্রত্যাখ্যান,
'আমি কি অহনো আছি কচি পোলাপান!'
অভিমানে ভরে বুক। পারি না কসাতে
সেদিনের মতো চড়, অথবা শাসাতে।।

৩

ছুটিতে ফিরিলে দেশে কুড়ানি জননী
আশীর্বাদ বরষিয়া কন—'শোন্ মনি,
কুড়ানি উন্নিশে পরে, আর রাহি কত?
হইয়া উঠতেয়াছে মাইয়া পাহাড় পর্বত।'
'সুপাত্র দেহুম' কহি দিলাম আশ্বাস,
চোরা চোখে মিলিল না দরশ আভাস।
ম্লানমুখ, নতশির, ফিরি ভাঙ্গা বুকে,
হঠাৎ শুনিনু হাসি। তীক্ষ্ণ সকৌতুকে
কে কহিছে,—'মা তোমার বুদ্ধি ত জবর!
নিজের বৌয়ের লাইগা কে বিস্রায় বর?'
সহসা থামিয়া গেল সৌর আবর্তন,
সহসা সহস্র পক্ষী তুলিল গুঞ্জন।
সহসা দখিনা বায়ু শাখা দুলাইয়া
সব কটি চাঁপা ফুল দিল ফুটাইয়া।।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯০৩-১৯৭৬

মোহনবাগান

আজকে দাদা, কালকে শালা,
বল্ তো দেখি কাহার বেলা?
আজ লাফিয়ে উঠছে ঘাড়ে,
কালকে তুলে আছাড় মারে?
আজকে তিড়িং তুবড়ি ছোটায়,
কালকে লেজে লেজুড় গোটায়?
পারে এনে ডোবায় তরী,
কেরদানি আর মাতব্বরি?
        থামুন, থামুন, কেন রাগান?
        মোহনবাগান! মোহনবাগান!

খত্তা নাকে বারে বারে
আর যাব না মাঠের ধারে।
গোখ্‌খুরি না গাঁজাখুরি,
হেই দেয়ালে মাথা খুঁড়ি।
আর হব না বে-আক্কেল,
কাকের কী হয় পাকলে বেল?
তার পরে ফের সময় হলে
গুটি-গুটি আসিস চলে?
        বুকে কেন লোহা দাগান?
        মোহনবাগান! মোহনবাগান!

সকাল হতেই খালি মাঠে,
কত মানত কালীঘাটে;

লোপাট জুতো, ছাতার বাঁট
জামার তলায় পকেট-কাট।
রোদে মুখে উঠছে গেঁজা,
বৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে ভেজা।
গোলের 'গোরু'ই হলি মার
খাওয়ালি না 'ওল'টি আর।
ঘায়ে কেন লবণ লাগান ?
তবু মোদের মোহনবাগান !

প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৯০৩-১৯৮৮

আদ্যিকালের বুড়ি

এক যে ছিল অ্যামিবা,
আদ্যিকালের বুড়ি;
রোগ ছিল তার খাই-খাই, আর
কিসের সুড়সুড়ি;
— কিসের কে জানে!

নেইকো মরণ হতভাগীর
নেইকো কোথাও কেউ;
ভেতরে তার ধুক্‌ধুকুনি,
বাইরে জলের ঢেউ।

মনের দুঃখে দুখান হল,
লাগল আবার জোড়া
যোগ-বিয়োগের খেলায় ভাবে,
পাবে রোগের গোড়া।

কালে কালে কতই হল,
সেই অ্যামিবা মানুষ হল,
মরার বাড়া গাল জানে না,
তবু ওড়ায় ঘুড়ি,
কেমন করে সারবে যে তার
আদিম সুড়সুড়ি।

চোখ গজালো, কান গজালো,

আরো কত কী,

দিগ্‌গজেরা বলে সব-ই

ভস্মে ঢালা ঘি!

— কিছু হয় না মানে।

রাধারানী দেবী

১৯০৩-১৯৮৯

মনের মতো

তোর অত খোঁজে কাজ কি বল্ তো?— তুই তো ঘট্কী নোস্!
ইশ্! অভিমানে রাঙা হলি যে লো!... আচ্ছা, বলচি, বোস্!
মনের কথাটি শোনাব,— কিন্তু গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্,
কাউকে এ কথা বলবি নি তুই,— এমন কি তোর বর!
আমি চাই ভাই খুবই সাদাসিধে,— নয় আকাশের চাঁদ।
জমকালো রাজা-উজীরে আমার একটুও নেই সাধ।
কিন্তু তা বলে যার-তার গলে দিতে তো পারি নে মালা!
বিয়ের বাঁধনে জানিস তো মনে মেয়েদেরই বেশি জ্বালা!
ছেড়ে দিয়ে লাজ খোলাখুলি আজ কানে কানে বলি তোর,
মনের মানুষ কেমনটি হলে মনোমতো হবে মোর।।

পুরুষমানুষ— লম্বা-চওড়া চেহারাটা হওয়া চাই।
রঙটা ফর্সা, মুখখানি ভালো— এ হলেই হল ভাই!
রূপনগরের রাজপুত্তুর খুঁজচি নে তাই বলে!—
নেহাত কুরূপ না হলেই হল,— চলবে সুশ্রী হলে।
শুধু আমি ভালোবাসি নে কো কালো, বেশি রোগা, বেশি মোটা—
বেঁটে মোটা লোক দেখলে আমার মনে হয় যেন— লোটা!
দেখতে পারি নে দু-চোখে পুরুষ— মেয়েলি চেহারা যার,
ফিন্‌ফিনে সরু ক্ষীণ-দেহ যেন লীলায়িত লতিকার!
মেনিমুখো সেই মানুষগুলোকে অসহ্য লাগে দেখা,
হাড় জ্বলে ওঠে শুনলে তাদের মিহি কথা ন্যাকা-ন্যাকা।
স্বাস্থ্য-সবল সুস্থ চেহারা 'ফিগার'টা চাই ভালো—
পুরুষমানুষ, পুরুষের মতো হবে বেশ জমকালো।
কিন্তু তা বলে চাই নে কো আমি বক্সার— পালোয়ান,
ষণ্ডামার্ক গুণ্ডাচেহারা— প্রকাণ্ড শা-জোয়ান।

কুস্তিগীরের মস্ত ভুঁড়ি কি 'স্যাণ্ডো'র 'বাইসেপ্'—
বাড়াবাড়ি আমি চাই নে কিছুরই, — মাঝামাঝি হবে স্রেফ্।
আলুর মতন মুণ্ডিত মুখ, ট্যাবা-করা গালে পান,
নস্যি দোক্তা দু-ই চলে, তবু চা পেলে বর্তে যান!

আরো বলি শোন্, হাসিস নে অত বসে খালি ফিক্‌ফিক্,—
টেকোমাথা-লোক দেখলে আমার থাকে না কো মাথা ঠিক।
ছোটোবেলা থেকে চাঁটিয়ে এসেছি টেকোমাথা কাছে পেলে,
সেই টেকো বর নিয়ে করা ঘর চলবে না আজ এলে।
তা বলে এ জেনো বাবরী চুলেরও নই 'ফর-এ' কোনোদিন,
ঝাঁকড়া শিথিল কাব্যিক কেশ এলোমেলো তেলহীন,—
চোখ-চাপা-দেওয়া টেরির বাহার— দেখে দেহ জ্বলে যায়;
ভালোবাসি চুল ভদ্রফ্যাশানে যত্নে যে আঁচড়ায়।।

লেখাপড়া-জানা পণ্ডিত কি না? ক-টা পাস হওয়া চাই?
—প্রশ্নটা তোর শক্ত এবার।— দাঁড়া, ভেবে বলি ভাই!

'য়ুনিভার্সিটি-মেড্' ছাপ মারা, বিলিতি ডিগ্রি আনা—
'স্কলার'-'ফেলো'তে লোভ নেই তত, বিদ্যে তো আছে জানা!
কিন্তু তা বলে মূর্খকে আমি ভেবো না করব বিয়ে।
ঢের ভালো ঘর-করা তার চেয়ে ওরাং-ওটাং নিয়ে।
ডজন হিসেবে পাস করে যারা চিনতে তো নেই বাকি।
সে সব বুকিশ্ বুর্জোয়াদের আসলে সবটা ফাঁকি।
হরফের হার চাই নে কো আমি বরমালা বিনিময়ে।
'অ্যালফাবেটের ফেটিশ্' যাদের, এড়াই তাদের ভয়ে।
আমি চাই যার জ্ঞানের আলোকে উদার হয়েছে মন,
মানুষ হয়েছে সত্যি যে প'ড়ে,— যথার্থ সজ্জন,
গ্রাজুয়েট হলে ভালো হয়, ত-বে, অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজ্
পেলে খুবই ভালো, যদিও জানি তা নকলনবিশ চীজ!

কী বললি?... তার আর্থিক আয় কত হলে খুশি হই!—
জানিস আমার হালচাল সবই, 'প্রিন্সেস' আমি নই।

টাকার কুমীর 'মিলিয়োনেয়ার' না হয় নাই বা হল।
ঐশ্বর্যের মোহ নেই মনে।— তবে যদি কথা তোলো,
খুলে বলি ভাই— থাকে যেন তার মোটামুটি কিছু আয়—
নির্ভাবনায় স্বচ্ছলে যাতে সংসার চলে যায়।
মাস গেলে যার মাইনেটি এলে তবেই চড়বে হাঁড়ি
এ রকম বরে ভরসা করাটা হবে না কি বাড়াবাড়ি?
বলা তো যায় না শরীরের কথা, কিছু নেই বিশ্বাস—
যদি মাস-ছয় পড়ে বিছানায়, তবেই সর্বনাশ।
যাবে একে একে গায়ের গহনা, বাড়ি দিতে হবে বাঁধা,
করতেই হবে নিজেকে তখন বাসন-মাজা ও রাঁধা,
শুধু রোজগারী হলেই হয় না— ওই এক মহা ভয়—
আপদ-বিপদ আছেই তো লেগে, সংসার সোজা নয়।
'ফিউচার'টাই ভেবে দেখা চাই বিয়ের ব্যাপারে আগে;
খালি ভাবে ভুলে ঝাঁপানো অকূলে নভেলেই ভালো লাগে।
'জি পি নোট' ছাড়া ব্যাঙ্কেও কিছু জমা আছে যার 'ক্যাশ'—
সাজানোগোজানো নিজের বাড়িটি, মোটরগাড়িটি— ব্যাস্।।

এ হলেই হবে; এর বেশি আর লোভ কিছু নেই ভাই।
...ছেলে-পিলে? — না না— রাতারাতি নয়, দু-একটি পরে চাই।

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৯০৪-

পণ

করেছি পণ, নেব না পণ
বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
স্যাকরা ডেকে দেখব নিজে
আসল কিম্বা কম্‌দরী।
সোনায় হবে সোহাগা যে
বৌ যদি হয় সুন্দরী।

তোমরা সবে শুধাও তবে—
আমিই বা কোন কার্তিক!
প্রশ্ন শুনে কোথায় যাব
বন্ধ দেখি চারদিক।
মানতে হল দরকারটা
উভয়তই আর্থিক।
স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর
মাইনের নাম কার্তিক।

বানভাসি

এল বান সর্বনেশে

এল বান সর্বনেশে গেল ভেসে হিমালয়ের নদীর পাড়
ডিব্রুগড়ে বাঁধ ভেঙেছে ঢাকার গ্রামে হাহাকার।

শহরের রাস্তা যত

শহরের রাস্তা যত খালের মতো কিস্তি চলে অবিরল
মৎস্য ধরে বেড়ায় কেউ আঙিনাতে অথই জল।

ওদিকে কুচবিহারে

ওদিকে কুচবিহারে চারি ধারে ছিন্ন হল যোগাযোগ
বিমানপথে যাবে যে তার নাইকো উপায়! কী দুর্ভোগ!

বিহারের উত্তরেতে

বিহারের উত্তরেতে ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় সমুদ্রের
কোথায় মানুষ কোথায় বাড়ি ভাসছে হাতি ভাসছে শের।

তরাই গোরখপুরে

তরাই গোরখপুরে একটু দূরে সাপ জমেছে, যেমন স্তূপ
বাঘগুলোকে মুখে পুরে কুমীরগুলো আছে চুপ।

কুমীরের পৌষ মাস

কুমীরের পৌষ মাস সর্বনাশ অন্য যত বন্যদের
বনস্পতি ভাসছে জলে, কুলায় কোথা বিহঙ্গের!

কেন যে বন্যা হেন

কেন যে বন্যা হেন ক্ষেপল কেন ঠাণ্ডা মাথা হিমাচল?
হাইড্রোজেন বোমা ফেলে বরফকে কেউ করল জল?

হেন বান কে হেনেছে

হেন বান কে হেনেছে কে জেনেছে বলতে পারো সমাচার।
কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।

হচ্ছে-হবের দেশে

সব পেয়েছির দেশে নয়, হচ্ছে-হবের দেশে
কাঁঠাল গাছে আম ধরেছে— খাবে সবাই শেষে।

দুধের বাছা, কাঁদো কেন? হচ্ছে-হবের দেশে
গোরুর বাঁটে মদ নেমেছে— খাবে সবাই হেসে।

হাত-পা কেউ নাড়বে নাকো হচ্ছে-হবের দেশে
ফাইল জমে পাহাড় হলে প্ল্যানগুলো যায় ফেঁসে।

কারখানাতে ঝুলছে তালা হচ্ছে-হবের দেশে
মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, বক্তৃতা দেয় ঠেসে।

মনের কথা লুকিয়ে রাখে হচ্ছে-হবের দেশে
সবাই ভাবে পেয়ে যাবে সব কিছু অক্লেশে!

লক্ষ্মী সোনা, ভয় পেয়ো না হচ্ছে-হবের দেশে
হাজারটা দল বাজায় মাদল বিপ্লবীর বেশে।

ক্লেরিহিউ

১

আচার্য জগদীশ বসু
উদ্ভিদকে বলেছেন পশু।
নতুন কথা এমন কী
অবাক হওয়াই আশ্চয্যি!

২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিম্বা পেরু না
সেইখানেই তো করুণা।

৩

শরৎচন্দ্র চাটুয্যে
মৌন আছেন মাধুর্যে।
সৃষ্টি এখন সবাক তাঁর
মঞ্চ পর্দা বেবাক তাঁর।

৪

নতুন রকম

ধন্য তোমার এনার্জি
চিত্তচকোর বেনার্জি।
হারতে হারতে হারাধন
করছ নতুন দল গঠন।

লিমেরিক

১

একটি লোক ছিল তার নাম হরিশ,
তাকে শুধালুম, তুই কী করিস?
বলে : 'আমি মারি যত গণ্ডার,
লুট করি বড়ো বড়ো ভাণ্ডার...'
আমি বলি, তারপর কী করিস?

২

অযোধ্যায় ফিরলেন রাম রাও।
হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম আমরাও।
এবার তোমরা যারা
মাস শেষে গদিহারা,
ঘরে বসে হাত পা কামড়াও।

রূথলেস্ রাইম

ছোটোগল্প পাঠিয়েছিলেন শ্রী হারাধন কারফর্মা
ছাপতে গিয়ে দেখা গেল, লেখা হল চার ফর্মা।
সম্পাদক শ্রী সেনশর্মা চালিয়ে দিলেন করাত—
লেখা হল চার পৃষ্ঠা, পাঠক, তোমার বরাত।

সৈয়দ মুজতবা আলী

১৯০৪-১৯৭৪

মার্জারনিধন কাব্য বা গুরবে কুশ্‌তন শব-ই-আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীর্নী ধরি
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি ?
মুশকিল-আসান আর মুর্শীদ মস্তান
কোম্পানি কি মহারানী, ইংরেজ, শয়তান ?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যে বা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা— কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভণে
বেদরদ বেধড়ক, ভয় নাহি মনে।।

ইরান দেশের কেচ্ছা শোনো সাধুজন
বেহদ্ রঙিন কেচ্ছা, বহুৎ বরন।
এন্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্বকৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ।।

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোড়া রাঙা পায়।
এ্যাসা পিরীতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।

দৌলতও আছিল বটে বিস্তরে বিস্তর
বাপ-দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ি তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এন্তারে এন্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন করিল শর্ত সে বড়ো অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কি না প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে!
এ বড়ো তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্‌খদ্
এ শর্ত মানিবে কে বা হয় যদি মর্দ্?
দুল্‌হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনি পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড়ো কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ।।

শীত গেল বর্ষ গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্‌ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রিজ আর আজরবৈজান
খুশিতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোটো ভাই বলে ফিরোজেরে
‘কী করে বাঁচিবে বলো, কী হবে আখেরে।
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু-মেয়ের সনে।’
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।

হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান।।

মজলিস জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হৈলা মত্ত হৈলা রসের কেলিতে।
পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসারে শুনে পুণ্যবান।।

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু-ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি সিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।
'তোমার মাথায় টাক নাই কেন?'
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
'টাক কেন, বলো তাই?'
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
'জোরে কি মারে না চটি?'
'আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি?
বাখানিয়া বলি শোনো কান পেতে
তরতিব কাহারে কয়
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলাময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।

খানা আইল যেই　　　　বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল　　　　মরমিয়া "ম্যাঁও"
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলওয়ার　　　　এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী　　　　আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা-টি না কাড়ে।
গুস্‌সা কৈরা কই　　　　এ সব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই　　　　বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।
তার পর কার　　　　ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি?'
সিতু মিএগ কয়　　　　নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

'ক্যাবাৎ' 'ক্যাবাৎ' বলি হাওয়া করি ভর
চলিলা ফিরোজ মিএগ পৌঁছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তার পরে শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে খানার ওক্তে খুল্যা তলওয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিএগ কল্লা বিল্লিডার
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্যা হুঙ্কারিয়া কয়
'তবিয়ৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।'
সিতু মিএগ শুনে কয়, 'শাবাশ, শাবাশ'।।

হায় রে বিধির লেখা, হায় রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতা দাড়ি ছিঁড়ে কয়
'তবিয়ৎ তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয়?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ!
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশো পয়জার।'
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
'ইয়াল্লা' ফুকারে সিতু, ভাগো পুণ্যবান।।
কোথায় পাগড়ি গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পৌছিল শেষে মতীনের বাড়ি!
কাঁদিয়া কহিল 'ভাইয়া কী দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।'
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।
বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
'বিড়াল মেরেছ' কয়, 'নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসল এলেমে তুমি করো নি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।'
বাণীরে বন্দিয়া বান্দা বান্ধিল বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান।।

মল্লিনাথস্য

স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারো নি এখন তাই কর হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পয়মাল।।

ইরানে এ কাহিনী সবিস্তর বলা হয় না। শুধু বলা হয়, 'গুরবে কুশতন, শব-ই-আওওয়াল'। অর্থাৎ গুরবে = বিড়াল, কুশতন্ = মারা, শব = রাত্রি, আওওয়ল = প্রথম। সোজা বাঙলায়, 'পয়লা রাতেই মারবে বেড়াল।'

শিবরাম চক্রবর্তী

১৯০৫-১৯৮০

পূর্বরাগ এবং পশ্চাত্তাপ

ডাণ্ডাস্ হোস্‌টেলে থাকে সেই মেয়ে অদ্ভুত সুন্দর।
বাসে যেতে আড়-চোখে দেখে নিল বাঁকাইয়া ঘাড়
আমাদের প্রাণকেষ্ট। ঊর্ধ্বশ্বাসে কতক্ষণ আর?
সুন্দর বললেই হয় যথেষ্ট, তবুও অদ্ভুত
বলা চলে সে মেয়েরে— বলা চলে অদ্ভুত সুন্দর।
সামান্য সুন্দর যেন বিশেষণ নহে মজবুত
সে মেয়ের।— প্রাণকেষ্ট ঘাড় নাড়ে, আপনারে বলে বারম্বার।
নিখুঁত সে মেয়েটির জন্যে মন করে খুঁতখুঁত :
প্রাণে তার নাড়া দেয় ডাণ্ডাস্ হোস্‌টেল-অভিসার।
কেষ্ট যত চাড়া মারে প্রাণ তত করে দুৎ দুৎ!
কেষ্টর তাড়ায় যদি প্রাণ যায় শেষে নির্ঘাত—
কেষ্ট-প্রাপ্তি ঘটে যায়? প্রাণের তা নয় মনঃপূত।
প্রাণকেষ্ট মনে মনে করে শুধু অগ্র ও পশ্চাৎ।

ডাণ্ডাস্ হোস্‌টেলে থাকে সেই মেয়ে অদ্ভুত সুন্দর :
ডাণ্ডাস্ হোস্‌টেলে থাকে : ডাণ্ডা যদি থাকে তারপর?

যথাপূর্বম্

আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমান্ হরিপ্রাণ
পত্নীর অতি বেশি বাধ্য;
গিন্নীর ত্রাসে তিনি সদাই কম্পমান,
খাদকের মুখে যথা খাদ্য;

মিছে মারধোর খেয়ে কখন বা প্রাণ হারান
        সাবধান রন যথাসাধ্য।
হঠাৎ কী হল ভাই, বিগত শীতে
নাম লেখালেন তিনি এ-আর-পি-তে।

তার পর থেকে ভাই কে জানে যে কী ক'রে
        পালটে গেল যে তাঁর পর্‌তা
এমন কি দেখা গেল তাঁর স্বীয় অন্দরে
        তিনি হয়ে বসেছেন কর্তা।
কী যে তাঁর হাঁকডাক, কী বা তাঁর গুম্ফ রে,
        দিচ্ছেন তাতে হরদম তা।
গোঁফ, খাঁকী, হেলমেট— সব নিয়ে না
বদলে গেলেন স্রেফ, যায় না চেনা।

কিন্তু তাঁহার এই পত্নী-বিজয় ভাই
        হল যে ক্ষণস্থায়ী খুব;
যে হাউই তীরবেগে উঠছিল পাঁইপাঁই,
        শূন্যেই দিল ফের ডুব;
এক মাঘ না ফুরোতে— এই বছরেই তাই
        দেখলেন তিনি হুবহুব
বউ তাঁর খেপে, যেই শীত পেরোলোই,
মেয়েলি এ-আর-পি-তে করে এল সই।

তার পর থেকে ভাই আগের মতন জের
        চলছে তাঁদের ঘরকন্না;
পুরোনো মূষিক ফিরে পুনরাগতই ফের—
        ম্যাও দেখে ভয়েই এগোন না;
গোঁফ তাঁর ঝুলে গিয়ে— পতাকা নত আগের—
        দাড়ির দুয়ারে দেয় ধরনা।
আবার হরিপ্রাণ পত্নীর বাধ্য
প্রাণপণে, সদা ভয় কবে হয় শ্রাদ্ধ।

অজিত দত্ত

১৯০৬-১৯৭৯

নইলে

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচ্যাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাক্‌টিস্‌ করেছ কি দৌড়ে?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া করে বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা?
নইলে রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

উচ্চকথক

উচ্চকথক কণ্ঠ তোলেন উচ্চ হতে উচ্চে।
নেই পরোয়া কেই বা তখন পড়ছে, কে ঘুমুচ্ছে।
কার বা ব্যামো, পরীক্ষা কার, নেই কিছুতেই বিকার,
বাজের চেয়ে জোর গলা যার তিনিই লাউড্‌স্পীকার।

সুরকে ইনি অসুর করেন, মিষ্টি করেন কটু,
ধনঞ্জয়ের মতন ইনি কর্ণবধে পটু।
রাগরাগিণী রাগিয়ে তোলেন, ধমক মারে তারা,
কোলের ছেলে চমকে কাঁদে, পথিক দিশাহারা।

চিন্তা ইনি দেন তাড়িয়ে, মনকে মারেন চাঁটি।
প্রমাণ করেন, এই দুনিয়ায় জোর গলাটাই খাঁটি।
ফিসফিসানো, গুনগুনানি, গোপন কথা, আর
কানে কানে কথায় ইনি দেন চড়া ধিক্কার।

এঁর প্রতাপে সংসারে হয় মিহি মোটা সমান।
দশের রীতি পালেন ইনি, রসের প্রীতি কমান।
সূক্ষ্ম করেন রুক্ষ ইনি, সুতোয় করেন কাছি।
মালা গাঁথা না হোক, ইনি গলায় দিলে বাঁচি।

বুদ্ধদেব বসু

১৯০৮-১৯৭৪

কবিমশাই

কবিমশাই, অনেক তো ধান ভানলেন;
বলুন এবার, বলুন দেখি সত্যি ক'রে,
ব্যাপারটা কী? আপনি — হ্যাঁ, আপনি নিজে
দেখেছেন তো প্রেমে প'ড়ে?

ঠিক না? তা বলুন না সে কেমনতর?
সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন;
লোকেরা যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায়
সেইখানে কি প্রেমের আগুন?

তা-হলে তো শরীরটাতেই সব মিটে যায়।
কিন্তু, দেখুন, মনও আছে;
মুশকিলটা এই যে মনের আরজি যত
পেশ করা চাই ওরই কাছে।

যেমন ধরুন, কাউকে দেখা মাত্র যদি
ঠিক চিনলেন মনের মানুষ,
কেমন করে পাবেন তাকে? কোন্ ফিকিরে
এক জোড়া মন — দামাল বেহুঁশ,

মিলতে পারে? না গো মশাই, কবুল করুন,
ছটফটানি সবই খাঁচায়;
উড়তে হলে একলা যাবেন; মিলতে হলে —
মিলতে হলে শরীরটা চাই।

কেমন মজা; — শরীরটা নিংড়ে ছিঁড়ে
কিছুতেই কি ইচ্ছে পোরে!
আবার, মনের সঙ্গে মনের মোকাবিলায়
শরীর এসে জখম করে।

ভালোবাসা? তা দেখুন না ভালো আমরা
কত কিছুই বেসে থাকি,
সোনাপিসি, কানা বেড়াল, টেবিল-চেয়ার
ইত্যাদি সব টুকিটাকি

যাদের সঙ্গে স্মৃতি জড়ায়। তেমনি বিয়ে;
ঘরকন্না, সঙ্গে খাওয়া, করুণ রঙিন
পিছন-ফেলা পথের কথা চোখে-চোখে—
যৌবনের আর মেয়াদ ক-দিন।

শরীর কিংবা স্মৃতি নিয়ে আমরা আছি।
আচ্ছা এবার বলুন দেখি,
এই যত সব খুচরো নিয়ে জীবন কাটে,
তাদের সঙ্গে প্রেমের কী?

মনে করুন আপনি যখন দেখেছিলেন
একটি মেয়ের হাতের নড়া
ঝলক দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে,
তারই নাম তো প্রেমে পড়া?

তখন যে-সব পাতাল-ঠেলা উথালপাথাল
দিয়েছিল পাগল ক'রে,
সে-উৎসাহ, সে-অশান্ত, সেই আনন্দ
বলুন তো তা কোথায় ধরে?

কাকের রূপে অবাক হয়ে তাকান যখন;
কিংবা, চৌরঙ্গি-মোড়ে
হঠাৎ কেঁপে থমকে দাঁড়ান কোনো কবির
পুরোনো লাইন মনে প'ড়ে,

এ সংসারে সেই প্রেম কি ধরে কোথাও
আপনাদেরই মনে ছাড়া?
আর সেখানে আয়ু তো তার এক-আধ মিনিট :
না, কাটে না কারোই ফাঁড়া।

তাই তো বলি, এত যে গীত বাঁধলেন
আপনাদেরই গোপন সে-গান;
আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি,
আমাদের আর কেন শোনান।

২৮ অক্টোবর ১৯৪৯

প্রভাতকিরণ বসু

১৯০৮-?

দুরদৃষ্ট

১

আমি জামার কলার দিছি দুমড়ায়ে
হাফ্-হাতা শার্ট পরেছি!
আমি কুড়ি টাকা দিয়া চশমা কিনিয়া
নাসিকা টিপিয়া ধরেছি!
মোর কোঁচা যে লুটায়ে বাধে পায়ে পায়ে,
সাদা স্যাণ্ডাল চরণে!
তবু যে মেয়েটি ট্রামে উঠিল, সে বামে
চাহিল না বাঁকা ধরনে!

২

আমি দেড়শো টাকার শাল জড়াইনু
সাতাশ টাকার কোটে গো;
মোর ক্যালিকো মিলের দামী মিহি ধুতি
জরীদার পাড় লোটে গো!
আমি সাপের ছালের পাম্প্-শু পরিনু,
সোজা টেরি চুল চিরিয়া!
তবু যে মেয়েটি বাসে উঠিল, এ পাশে
দেখিল না হায় ফিরিয়া!

৩

আমি সাহেব বাড়ির স্যুট চড়াইনু
ফেল্ট ক্যাপ, সাজ মিলাতে!

আমি টপ্ টু বটম্ সাজিনু যে সাব্,
ঘুরিয়া আসিনু বিলাতে!
মোর মুখে সিগারেট্, খাঁটি ইংরাজি,—
বাংলা ভুলিনু ঝাঁ করে!
তবু যে মেয়েটি ট্রেনে ওঠে জংশনে,
হেরিল না মোরে হাঁ করে!

৪

আমি সামার্‌কুলের শ্রাদ্ধ করিনু,
পুল্‌ওভার সারা পরিয়া,
আমি মোটর হাঁকায়ে, ঘাড়টি বাঁকায়ে
চাল দিনু শেষ করিয়া!
তবু হায় অদৃষ্ট! কারও অনিষ্ট
হল না প্রেমের ব্যাপারে!
আজ ভাগীরথীমুখো, নিয়ে থেলো হুঁকো
টানি, মাথা ঢেকে র‍্যাপারে!

পরিমল রায়

১৯০৮-১৯৫১

মেয়েমহল

কোথাও করিলে কেহ গানের ফরমাস
অজ্ঞ যদি হও কণ্ঠ কোরো না প্রকাশ।
তোমার হয়তো নাই সংগীতের গলা,
চীৎকারিয়া দশ দিক কোরো না উতলা।
অবশ্য যদি সে হয় মেয়ের মহল
যত ইচ্ছা গান গাক আনাড়ির দল।
গানের ফরমাস করি শুনিবে সে গান,
এমন কোমল নহে স্ত্রীলোকের প্রাণ।

দিল্লী-কা ছর্‌রা

১

আকাশে ও অঙ্গনে নিদারুণ কনকনে
এখনই যা ঠাণ্ডাটা বইল,
কী হবে যে পৌষে— জানি নে আদৌ সে,
ভেবে মন শিহরিত হইল।
ওরে তোরা রুষ-কে দে না ভাই উসকে,
সোভিয়েট এসে যাক তালুকে।
কাঁথা যার সম্বল, চাই তার কম্বল।
সারা দেশ ছেয়ে যাক ভালুকে।

২

লোকে মরে বাংলায়, কে বা কাকে সামলায়,
দিল্লীর দায় নয় এক তো,

ফকির অব্ ইপি-কে করে টেপাটিপি কে,
অতএব কোরো নাকো ত্যক্ত।
সবই হবে আস্তে, শেখো বাপু হাসতে,
হেসে হেসে প্রাণ দাও বাঙালি,
শরীরে কি প্রাণ নাই? আছে শুধু কান্নাই?
এ কী প্রাণ ধারণের কাঙালি!

বিষ্ণু দে

১৯০৯-১৯৮২

মন-দেওয়া-নেওয়া

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে, —প্রায়ই করে,
আগেকার মতো— তার মানে এই দু মাস আগের
মতো আর মন বাহবা দেয় না।
প্রেম জিনিসটা কি নির্বোধের ?
দু মাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল,
রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা
লাগত ভালো!
তখনের সেই অবস্থা নাকি প্রেমের বাসা ?

আসল কথাটা আমি যা বুঝি
প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি।
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাই তো খোঁজে—
তার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে।
এরই নাম 'প্রেম'।
কিন্তু মানুষ কেমন ক'রে যে এইতে বাঁচে—
মানে, এই প্রেমে কাব্যি ক'রেই সারাটা জীবন কাটিয়ে যে দেয়!

আশ্চর্য না ?
এই ধরো— আমি, নবনীকান্ত—
দিব্যি মহৎহৃদয়, দিব্যি ভালোই ছেলে—
অনেক মেয়েই চায় তো আমায় তাদের স্বামী!
ইতিমধ্যে যে গোল পাকিয়েছি—
ডলু— মানে এই মৈত্রেয়ী ঘোষ নাম্নী মেয়ের
প্রেমে প'ড়ে গিয়ে!

কাব্যির ঘোরে কত উচ্ছ্বাস ঐ বেচারার গলায়-গালে—
দু হাতে বাহুতে বুকে আর ঠোঁটে তার দিয়েছি!
ডলু যদি সেটা— চিত্রগুপ্ত যেমন করে—
সব কর্মের হিসেব-নিকেশ চুলচেরা ভাবে খাতায় ধরে;
ডলু যদি এই প্রেমের বিষয়ে সে-রকম ভাব মাথায় ভরে?
বিহিত কি তার?
কীই যে করি!
অমল মোহিত ইত্যাদিকে তো এগিয়ে দিলুম—
'ডলু যে তোমার খোঁজ করে ওহে!'
কতটা আশাই না করেছিলুম।

হল না কিছুই!
আই-সি-এস্-ও অকাতরে ডলু ফেলেই দিল!
(মেয়েরা কী বোকা!)
আর সেই দিনই দুপুর বেলায়
বাস্-এ ক'রে ডলু এই এইখানে
আমার এ-ঘরে চ'টে এসেছিল!
সে-কথা যাক্, তা কথাটা হচ্ছে
কেমন ক'রে
ডলুর কঠিন করুণার হাত এড়ানো যায়?
তা অবশ্য কোনো গোল না ক'রে—
তা না তো আবার স্ক্যাণ্ডালে দুই কান বেচারিরা যাবে যে ভ'রে।

মহা মুশকিল!
ঝগড়া করতেগেলেও ডলুর প্রেমই জাগে!
আমি যদি খুব সাবধানে কোনো আভাস তুলি—
ডলুর দোষ যে আমার কেমন বিশ্রী লাগে!
আশা করি ডলু চট্‌বে, কিন্তু সে চটে নাকো!
হয়তো বা বলে, 'ও দোষ যে আছে, আমি তা মানি,
তাই ব'লে চুমো খাবে না আমাকে?
—তোমার ও-মুখ এখানে রাখো।'

কিন্তু ডলুর দেহ ও মনের অলিগলি যত সবই জানা,
(আগেই বলেছি, অজানাই হল প্রেমের নানা,
শারীর, মানস, ভাবের বাণী)
ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে
ডলুই নিজে।
এমন কি সেই আঁচিলটা— তা-ও!
সেটাও জানি!
নতুন তো নেই কিছুই! এখন করব কী যে!
করব কী যে?
বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে!—
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
পাব না কি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে?
ক্লান্ত লাগে।

ছড়া

কে দিয়েছে বিয়ে যে তাঁর, পাই না রে ভাই ভেবে
তিন কন্যের মান অভিমান, বৃষ্টি আসে নেবে।
এ পারে গঙ্গা ও পারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারই মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর।
আমাদেরই সে আপনজন তো, দেখলে কষ্ট হয়—
ভরাডুবিতে নৌকা গেছে, প্রাণটা রইলে সয়।
সগর রাজার জোয়ার আসে, ঘরে নেইকো ধান
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর তার ওপরে বান।
মাসতুতো ভাই উধাও সবাই, উঠছে কালাপানি
এই বিপদে জলে কুমির ডাঙাতে বাঘ জানি
ওৎ পেতে রয়, শিব সদাগর নামবে কপাল হেনে
আমাদেরই সে আপনজন তো কেমনে আনি টেনে।

এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারই মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
খেয়ে দেয়ে বিলেত গিয়ে জমান পেন্‌সান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান—
বাপের বাড়ি মেসোর বাসা, নদেয় আসে বান।
যে কন্যেটি রাঁধেন বাড়েন, তিনি বলেন সেধে
সিন্দুকটা ভেঙে এসো ভেলা বানাই বেঁধে।
মহাজনী তক্তা আহা! সদাগরনন্দন
শিউরে উঠে ভাবেন কোথায় দিল্লী রে লণ্ডন।
দেখ কন্যে কেঁদে, যদি গলে সোনার প্রাণ।
আকাশ জুড়ে মেঘ ডাকে ঐ নদেয় এল বান।

এপিগ্রাম

এলার্জি

অবাক সবাই ভাবি কী অধ্যবসায়,
বাক্‌দেবীকে ক'রে দিলে মুমূর্ষু মশায়!
কার্তিনাশা লেখা ছাপে কীর্তির আর্‌জিতে,
জানে না বাক্‌দেবী দুঃস্থ তারই এলার্জিতে।।

অমুকবাবু

কলকাতায় সুখ নেই, ঘরে পথে ভিড়;
অর্থাভাব চিরস্থায়ী; আড্ডাতেও চিড়,
নিত্যসঙ্গী টাইফয়েড, বসন্ত, কলেরা :
এবং অমুকবাবু, দুর্ভোগের সেরা।।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৯১০-১৯৮২

গোলমেলে ছড়া

কৃষ্টির মাঠে ঘাটে গোলে হরিবোল দে।
ন্যাবা খায় ভ্যাবাচ্যাকা দুনিয়াটা হলদে।।
অমিলের মিলে মিল চলছে না মেলানো।
অরসিকে রস যেন গলা টিপে গেলানো।।
ভাবনার ধোঁয়া ধোঁয়া রোঁয়া-ওঠা পক্ষী।
ওড়ে না মাটিতে সয় নিদারুণ ঝক্কি।।
আগা নেই গোড়া নেই আজগুবি ঠাট্টা।
রোদে পোড়া টাকে যেন বোশেখের গাঁট্টা।।
ফুল আর ফোটে নাকো এ যুগের বোঁটাতে।
পারে না সে মধুপায়ী মৌমাছি জোটাতে।।
ভাঙা হাটে তবু চলে রাতদিনই হৈ চৈ।
জোটে নাকো ফলারের চিঁড়ে কলা খৈ দৈ।।

বিজ্ঞেরা প্রাণপণে হাসে সিকি ইঞ্চি।
বারবার দেখে ঠেকে ইদানীং চিনছি।।
ওঁদের বোধের কোনো নেই আজও সীমানা।
জুতোকে বলেন ওঁরা পদতরী বিনামা।।
না বোঝার যুগে দেখি বোঝার যে দাম নেই।
বোঝা যারা মজলিসে তাদের তো নাম নেই।।
নানা দলে গান ধরে দাঁড়কাক হাড়ি চাঁচা।
ভাঙা ক্ষুরে এ যেন রে অসুরের দাড়ি চাঁচা।।
রাহু খায় চাঁদ গিলে পানা-পড়া পুকুরে।
ভেউ ভেউ কেঁদে ওঠে তিনমুখো কুকুরে।।

চোখ বুজে নাজেহাল দু-চোখের ঊর্ধ্বে।
মন বলে ওম্ তোম্ তানা নানা সুর দে॥
তানপুরা বাঁধা আছে, টেনে বাঁধ বাঁয়াটা।
কণ্ঠ জড়ায় এসে মাইকের মায়াটা॥
ঘেমে ওঠা তারাগুলো আকাশের ঈথারে।
জুড়ে যায় ফাটা মাটি বুকে নিয়ে সীতারে॥
বৃদ্ধেরা ঠোঁট চেপে জোড়া ভুরু কোঁচকায়॥
নজরটা ঠিকই আছে স্বর্গীয় বোঁচকায়॥
এ যুগের মাপাজোপা কী কঠিন থিয়োরী।
রোমে রোমে অনুভূতি ওঠে যেন শিহরি॥
আসলে মাথায় ঘিলু হওয়া চাই ধোঁয়াটে
যত খুশি ভাঙো তবু পারবে না নোয়াতে॥
মাথা যদি নাই থাকে, প্রজ্ঞার ক্ষতি কী?
কাব্যের ষোলো কলা দুরন্ত প্রতীকী॥

হালফিল দেখে এসে শো-কেসের পাঁয়তারা
লিখে রাখে রঙচঙে মলাটের গায় তারা॥
হৃদয়ের সাক্ষীরা কে যে কার জবানী
শোনাবে সে গূঢ় কথা? ভাড়ে কাঁদে ভবানী॥
বাক্যের ফুলঝুরি ফুল কাটে ম্যাজিকে
ছাগেতে কুকুর ভ্রম মেলে তবু 'লজিকে'॥
খালি পেটে ধুঁকে ধুঁকে দুপুরের সূর্য।
মাথায় আগুন ঢালে তেজোভিরাপূর্য
লালদিঘি রেগে লাল পিচ গলা ধোঁয়াতে
ভেবো না সে কেন গেল চাকরিটা খোয়াতে॥
ভক্তির নামাবলী প্রভুপদচিহ্নে
ওরে মন দেখ চেয়ে চোখে দূরবীন নে॥

পাঁচশালা বিধানের কাকাতুয়া ঝুঁটিদার
ইদানীং গায়ে দেয় পাঞ্জাবি বুটিদার॥

চিনরঙা খেতাপের কাব্যিক চিন্তা
তবলায় চাঁটি মারে ধেরে কেটে ধিন্‌তা ।।
এ যুগের কবিযশ কেটেকুটে মর্গে
চিতায় চালান দেবে পাইকিরি স্বর্গে ।।
আগা যদি খোঁজো তবে খোঁজা চাই গোড়াটা
রসনার বাসনাতে শিল আর নোড়াটা ।।
শব্দের ধোঁয়া পিষে মিহি মিহি মশলা
কাব্য কাবাবে দিলে জিভে ঝরে পশলা ।।
ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে নামে খর বৃষ্টি
গোলে হরিবোল দেয় গোলমেলে কৃষ্টি ।।

জগদীশ ভট্টাচার্য

১৯১২-

উপদেশ

১

প্রেমেই যদি পড়তে চাহ দাদা রে
পকেট আগে ভরতি করো টাকাতে,
নইলে জেনো ভাগ্যে আছে কাঁদা রে—
ব্যর্থ রোদন অরণ্যেরই ফাঁকাতে।
লাখ টাকাতে হস্তী পোষা— প্রবাদে
মিথ্য বলে উড়িয়ে দিয়ো অবাধে;
কিন্তু ইহা সত্য জেনো অকাট্য—
প্রেম করাতে খরচ সে তো অল্প না,
হয়তো ইহা হইতে পারে অপাঠ্য,
কিন্তু খাঁটি সত্য কথা, গল্প না।

২

ভুক্তভোগী পাচ্ছে না কূল অশ্রুতে
জানবে ইহা বলছে মহাপ্রাজ্ঞেতেই,
ইচ্ছা করে ভাসবে নাকো ও স্রোতে
নইলে বহু কষ্ট আছে ভাগ্যেতেই;
প্রেম করাতে দেখছি বহু বিঘ্নও
রাত্রি-দিনই থাকিবে উদ্বিগ্নও;
কখন কী যে হয় রে দাদা কে জানে,
শত্রুরা ওৎ পেতেই আছে চার দিকে!
যায় না বলা কখন কারে কে টানে,
কারে ছেড়ে নজর দেবে কার দিকে!

৩

এ সব শুনে হুঁশ না হলে শেষটাতে
আছে তোমার বহুৎ কিছু লাঞ্ছনা;
লোকের বদন যায় না ঢাকা চেষ্টাতে
'কাগজ' প'ড়ে সে কথা কি জানছো না?
প্রিভেন্‌শান-ই শ্রেষ্ঠ জেনো সর্বদা
অর্থ কভু নয়কো চতুর্বর্গদা;
পরকীয়ায় বিপদ আছে অগণ্য;
সুযোগ পেলে ছাড়বে নাকো শোধ নিতে,
মার্গ আছে ধার্য করা অনন্য—
loverটিরে legal করো পত্নীতে।

অজিতকৃষ্ণ বসু

১৯১২-১৯৯৩

পাঁচন-তত্ত্ব

ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের পাঁচন করিয়া পান
অসীম আমার ক্ষুদ্র হৃদয় নিয়ত কম্পমান
নব সৃজনের আনন্দ-বেদনায়।
বিশ্বভুবন সৃজন-বিধাতা
আমার সমুখে নোয়াইছে মাথা
অণুতে আমার অনন্ত জেগে করিছে ঘুমের ভান
নব রাগিণীর সুরের মূর্ছনায়।
চারণ হইয়া গোচারণ যারা করিছে সবুজ মাঠে,
পিছে থেকে যারা যোগায় রসান মিছে হল্লার হাটে,
বেসুর বীণায় তোলে ফাঁকা ঝঙ্কার।
নিত্য রচিয়া নূতন হেঁয়ালি
দুপুরের রোদে জ্বালায় দেয়ালি,
বেলে মাটি দিয়া পুতুল গড়িয়া শোয়ায় সোনার খাটে
রঙিন কাঁচের পরায়ে অলঙ্কার,
তাদের চিত্র আমার খাতায়
এঁকে রাখি আমি পাতায় পাতায়।
কান পেতে পেতে আনমনে আমি শুনি তাহাদের গান
ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের পাঁচন করিয়া পান।।

পরার্থে

নদী নাহি পান করে আপনার জল
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।

ময়রারা নাহি খায় নিজ নিজ মিঠে
ঘোড়া কভু নাহি চড়ে আপনার পিঠে।
মুরগীরা নাহি খায় নিজ নিজ আণ্ডা
না খায় পুলিশ কভু আপনার ডাণ্ডা।
কবিরাজ নাহি খায় নিজের পাঁচন
আপনার নাড়ী নাহি টেপে কদাচন।
বিচারক নাহি করে আপন বিচার
আপন চিকিৎসা কভু করে না ডাক্তার।
পরি চোগা চাপকান মাথায় শামলা
মোক্তার করে না কভু আপন মামলা।
হাইকোর্ট নাহি শোনে আপন আপীল
না খায় বিলের মাছ যারা সেঁচে বিল।
বিধাতা নিজের তরে করে না বিধান
আপনারে ভক্তি নাহি করে ভগবান।
মন্ত্রীরা না দেয় কভু নিজেরে মন্ত্রণা
কবিরা পায় না টের কাব্যের যন্ত্রণা।
ছাত্রেরা দেয় না মন নিজ নিজ পাঠে
গাঁটকাটা আপনার গাঁট নাহি কাটে।
মহাত্মারা নিজেরে না দেন উপদেশ
পরের হিতার্থে মন করেন নিবেশ।

কুমারেশ ঘোষ

১৯১৪-১৯৯৫

হরিপদ পাল

হরিপদ পাল ভাবছিল বহুকাল
কী করে আনবে ঘরে সোনা তাল তাল।
হরিপদ পাল পাতল এক জাল
ব্যাবসা পুকুরে। তেলে মেশালো ভেজাল।।

ঘুঘু

অন্য লোকের ভিটেয় বসে ঘুঘু যখন ডাকতে থাকে।
সে ডাক এত মিষ্টি লাগে, সে কথাটা বোঝাই কাকে।।

সমর সেন

১৯১৬-১৯৮৭

ফ্লাড-রিলীফ

পাণ্ডববর্জিত এ দেশ।
সকালে বৃষ্টি, বিকেলে মন্ত্রী,
হাট নষ্ট।
চারি ধারে ধানক্ষেত ভেসে গেল, বৃষ্টি আর থামে না,
দলে দলে তাই চলেছি সভায়,
দেখি আগন্তুক মন্ত্রী কী বলেন।
কী যেন খেয়ে তাঁর ঘোরতর অম্বল, রক্তবর্ণ মুখ,
তাই স্বল্পভাষী; বিজয়ী প্রসাদে গেলেন ফিরে;
যাতায়াতী খরচ কত
পৈটিক রসদ কত কঠিন তরল,
শত্রুপক্ষ নানা কথা বলে। আবার বৃষ্টি।

আনন্দমঠ

ঘৃণ্য শূদ্র যত শতহস্ত দূরে রেখে
গৌরবে পড়েছি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত,
দুর্দান্ত যবনকালে সেজেছি বৈষ্ণব।
ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এল; স্বাগতম্!
পড়েছে মুসলমান, বন্দেমাতরম্
ধ্বনি ওঠে ঘটিরাম ডিপুটির ঘরে,
যবনদুর্যোগে শেষে আহা মরি
শ্বেতাঙ্গ সকাল!

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯১৬

কাঁটা, ফুল ও প্রজাপতির কথা

এক যে ছিল রাজপুত্তুর, তাঁর ছিল খুব টাকা
বয়স যেম্নি হল ওম্নি গজালো তাঁর পাখা;
মাথায় সোনার টোপর, গায়ে বিচিত্র আংরাখা।

এদিক ওদিক ঘোরেন ফেরেন নিকট ও দূর দেশে
কন্যেরা হন হন্যে শুধু তাঁকেই ভালোবেসে।
শেষটা গেলেন পুষ্পরানীর চুলের ফাঁসে ফেঁসে।

পুষ্পরানী সুন্দরী খুব; সখীটি কুচ্ছিত,
হিংসুটে, আর বিবেকে তার নেইকো হিতাহিত।
পুষ্পকে সে হিংসে ক'রে খোয়ালো সংবিৎ।

রাজপুত্তুর বলেন— 'পুষ্প, তোমায় নিয়ে পাড়ি
দেব কালই।' অম্নি সখী শুনল পেতে আড়ি,
হিংসেতে সে জ্ব'লে-পুড়ে গেল বদ্যির বাড়ি।

সেখান থেকে বিষ আনল সোনার কৌটো ভ'রে,
খাবার পাতে মিশিয়ে দিল অনেক ফন্দি ক'রে।
পুষ্প ও তাঁর রাজপুত্তুর সেই বিষে যান ম'রে।

মৃত্যুর পর ফুল হয়ে যান পুষ্পরানী সতী;
রাজপুত্তুর হলেন রঙীন প্রেমিক প্রজাপতি।
প্রেমের দেবীর বরে তাঁদের হয় না কিছু ক্ষতি।

হতকুচ্ছিত সেই সখীটা ছিল বেজায় ঠ্যাঁটা,
প্রেমের দেবী রেগে বলেন পিটিয়ে মুড়ো ঝাঁটা
'হিংসে যখন করিস্ ওদের, তুই হো গে যা কাঁটা।'

তাই তো আজও ফুল ফুটলেই পেরজাপতি আসে,
তাই তোমরা পাচ্ছ কাঁটা গোলাপফুলের পাশে।।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৯১৭-১৯৭৬

দরোয়ান

হামি জমিদারবাবুর দরোয়ান। সড়কের পাশে দেউড়িমে থাকি। খৈনি খাই। ঘাসে
লাঠি ঠুকি। রসুই পাকাই। বাবু মস্ত রাজা। আছে নোকর-নায়েব-সিপাই
আউর পুরোনো মস্ত বাড়ি আউর বারোটা জুড়ি, সতেরোটা হাওয়াগাড়ি।
বাবুর বড়ো ছেলে মেট্‌ট্রিক পাশ দিল। বাবু সাত দিন মদ খেল। দোসরা মহলে
বাবুর লেড়কা ভি। মস্ত ভোজ হল। বাইজি নাচল। মাইজি
বড়া ভারী সোনার হার বকশিশ দিল। মিষ্টি বিলি হল।

সেদিন খেঁদি ঝি আউর তার লেড়কিকে মাইজি ঝাঁটা পিটে তাড়াল। হামি জানি কার
ঘরে মাঝরাতে তার লেড়কিকে মিলেছিল। (সে বাবুর বড়ো ছেলে)। তাতে
হামাদের কী? হামি খৈনি খাই, রসুই পাকাই, দেউড়িমে থাকি।

বাবুর এক বিটি ভি আছে। ডেরাইভারের কাছে
সে ঠাট্টা করত, হাসত ভি মগর মালুম হুয়া নেই তার সাথ ভগবে কভী!
ভিতর ভিতর বহুত গণ্ডগোল পুলিশ রুপেয়া ঘুষ
হামরা ভি বকশিশ পেয়ে খুশ।
লেড়কি লৌটকে এল
ফুর্তিসে বাবু আউর লেড়কা দোসরা-দোসরা মহলে বহুত মদ খেল।

ইস্‌মে তুমার কী, হামার ভি কী?
হামি জমিদারবাবুর দরোয়ান, দেউড়িমে থাকি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৯১৯-

আলাপ

বার্ষিক

তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কমরেড?
বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে;
পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায়।
আকাশে অসংখ্য টর্চ; মেঘেরা ফেরার—
গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে।
বসন্ত সত্যিই আসবে? কী দরকার এসে?
বছর-বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যাম্বেলের ভিড়ে।।

পশুশ্রম

অনেক দিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু-খোঁজা ক'রে
নীলাকাশে, অন্ধকারে গৈরিক নদীতে;
তারপর আত্মহারা অধিক রাত্রিতে
যখনই দিয়েছি সাড়া যে-কারও ইঙ্গিতে,
তখনই পিছন থেকে বলেছে, বিদায়—
ভগ্নমনে সচ্চরিত্র গুপ্তচর কোনো।।

আশ্চর্য কলম

এই যে দাদা, এতদিনে বেরিয়েছে—
নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম : 'খাই-খাই।'

চোর, জোচ্চোর, লোচ্চা, লম্পট, খাজা, খোজা,
পণ্ডিত, মূর্খ যে-কেউ চোখ বুঁজে
রাতারাতি লেখক হতে পারে।
এ কলম হাতে থাকলে
বসা বা দাঁড়ানো, চিৎ বা উপুড়
যে-কোনো অবস্থায়
প্রকাশ্যে ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া যায়—
কোনোরকম তাগবাগ বা রাখঢাকের দরকার হয় না।

দিনকে রাত, সোজাকে কাত,
হতাশকে হাত করতে
এ কলমের জুড়ি নেই।
মনে রাখবেন, নতুন ফরমুলায় তৈরি
খলিফাচাঁদের আশ্চর্য কলম
'খাই-খাই।'

রাঘববোয়াল থেকে চুনোপুঁটি
হরেক সাইজের পাওয়া যায়;
দাম উত্তম মধ্যম হিসেবে।
সঙ্গে বিনামূল্যে চুন এবং কালি।

এ লাইনে
যদি কোনো ভদ্রলোকের আবশ্যক হয়
বলবেন।।

ছড়াই

যাব কেবল চোঙা ফুঁকে
নুন দেব না জোঁকের মুখে
তাড়িয়ে দিয়ে মা-ছি
খাচ্ছি দুধের চাঁ-ছি

আমার নাম নিধিরাম শর্মা
ভারত এই অধীনের সৎমা।।

হলে চোখোচোখি
বল্, 'জী আজ্ঞে।'
মোড় ঘুরল কি?
যা পিছে লাগ্‌গে।।

সরকারী এঁটোকাঁটার হিস্যা
পাবার জন্যে এ-ওকে ঈর্ষ্যা।।

অবাক কাণ্ড ঘটে এমন যে!
কাঠের পুতুল পাথরে ব্রোঞ্জে।।

হাত পেতে রাখো
কিছু পাবে না কো।
হাতে বাঁধো মুঠো—
একটা না, দুটো।।

বেলা গেল নাকি? ভুলেছি বলতে—
পাকানো হয় নি সকালে সল্‌তে।।

ভোটকম্বল ভোটকম্বল
অষ্টরম্ভা জোট সম্বল।
নেভাবে আগুন কোন্ দমকল?
ভোট কম বল্ ভোট কম বল্।।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯২০-১৯৮৬

ধিক্ সুকুমার

তিনি নন শেক্‌স্‌পীয়র
লুই ক্যারল অথবা লিয়র;
যান নি কখনও বাগদাদ, তিনি দেখেন নি হনুলুলু;
শোনেন নি লিলিপুটিয়ানদের উলু;
কখনও সাবান মাখিয়ে সভ্য করেন নি তিনি কাফ্রি অথবা জুলু!

তিনি নন ডন কুইক্‌জোট কি গালিভার;
হারুন্ অল্ রশিদের সাথে তিনি করেন নি তিমি শিকার;
তিনি শুধু সুকুমার :
জন্মেছিলেন বঙ্গে এবং লিখতেন বাংলায়...

তাই, ধিক্ তোকে! ধিক্ তোকে! তাই, ধিক্ সুকুমার রায়!

অরুণকুমার সরকার

১৯২২-১৯৮০

সাবেক

সবাই ইয়ার-বন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়।
প্রবাসীরা ফিরে আসে উনিশশতকী টেরি কেটে।
হেই, হাসিখুশি চাঁদ, প্রাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বলে,
দু দণ্ড একজোট হয়ে ছিমছাম ধোঁয়া ছাড়ি এসো;
থাক ঝাপসা হয়ে যত ফুটোফাটা ছেঁড়া আবর্জনা।
এসো গো অপ্সরী হাওয়া, নাচো, গাও, স্ফূর্তির ফোয়ারা
ছোটাও গড়ের মাঠে প্রগল্‌ভ ঘাসের পাতায়।
মঞ্জীরধ্বনিতে স্বপ্ন আঁকো পানসি নয়নপল্লবে।
তুমি বা লাজুক কেন? ডেকে ওঠো গজলে ঠুংরিতে
কুহুকুহু কুহুকুহু চিতচোর, হে বসন্তসখা।

সবাই ইয়ার-বন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়।
তবু, ওহে নটবর, ফিরে চল নিজ নিকেতনে।
চত্বরে ভেঙো না হাঁড়ি, ঠারে-ঠোরে পিপাসা মেটাও।
যদি না জ্বলজ্বল করো, লোক হাসাতে সভায় যেয়ো না।

সত্যজিৎ রায়

১৯২২-১৯৯২

জবরখাকি

বিল্লিগির ওই শিঁথলে যত টোবে
গালুমগিরি করছে ভেউ-এর ধারে
আর যত সব মিম্‌সে বোরোগোবে
মোমতারাদের গেবগেবিয়ে মারে।

'যাস্‌ নি বাছা জবরখাকির কাছে
রামখিঁচুনি রাবণ-কামড় তার,
যাস্‌ নি যেথা জুবজু ব'সে গাছে
বাঁদরছ্যাঁচা মুখটি ক'রে ভার।'

তাও সে নিয়ে ভুরপি তলোয়ার
খুঁজতে গেল মাংসুমি দুশমনে,
অনেক ঘুরে সন্ধ্যে যখন পার
থামল গিয়ে টামটা গাছের বনে।

এমন সময় দেখতে পেল চেয়ে
ঘুল্‌চি বনে চুল্লি-চোখের ভাঁটা
জবরখাকি আসছে বুঝি ধেয়ে
হিলফিলিয়ে মস্ত করে হাঁ-টা।

সন্‌ সন্‌ সন্‌ চলল তরবারি
সানিক্‌ সিনিক্‌। জবরখাকি শেষ।
স্কন্ধে নিয়ে মুণ্ডখানা তারই
গালুম্ফিয়ে যায় সে আপন দেশ।

'তোর হাতেতেই জবরখাকি গেল?'
শুধোয় বাপে চামুক হাসি হেসে।
'আয় বাছাধন, আয় রে আমার কেলো,
বিম্বি আমার, বোস-না কোলে এসে!'

বিল্লিগির ওই শিঁথলে যত টোবে,
গালুমগিরি করছে ভেউ-এর ধারে
আর যত সব মিম্‌সে বোরোগোবে
মোমতারাদের গেবগেবিয়ে মারে।

—লুয়িস ক্যারলের 'জ্যাবারওঅকি' অবলম্বনে।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

১৯২২-

ঘোড়া করো ভগবান

মানবজীবন খোঁড়া ক'রে প্রভু ঘোড়া করো ভগবান,
বেতো ঘোড়া নয়— ছ্যাকড়া টানিয়া বেঘোরে যাইবে প্রাণ।
রেস্‌কোর্সের ঈপ্সিত ঘোড়া করে মোরে ছেড়ে দিয়ো,
তোমা চেয়ে বেশি ভক্ত জুটিবে শনিবারে, দেখে নিয়ো।
প্রতি শনিবারে মোর লাগি হবে উদ্দাম জনরোল,
গ্রীবাটি বাঁকায়ে নূতন ঢঙেতে শুনিব সে কলরোল।
এমনি তো কেউ ফিরে নাহি চাহে, কুঁচকায় নাকো চোখ,
রজত সায়ক ছুঁড়িবে তখন খালি ক'রে নির্মোক।
আমার পূজারী পাই নাকো খুঁজে আশেপাশে খুশিমতো,
রেস্‌-ঘোড়া হলে আমারে জপিয়া মরে যাবে লোকে কত।
সপ্তাহ ধরি ফিসফিস করি হবে কত কানাকানি,
ডুয়েল লড়িয়া আমারই জন্য ফাটাইবে মাথা জানি।
মোর ফ্যান্‌সি-তে হবে গৃহছাড়া— সেই তো আমার দাম।
তুমি যে গো কেন বুঝিয়া বোঝো না, কেন বিধি হও বাম?
মোর কথা কত রাখিবে গোপনে, শুনিতে না পায় মাছি!
আমার সহিসে— রাজার দুলালও করিবে আমড়াগাছি!
বাইশ বছর মানবজীবন কাটায়ে দেখিনু প্রভু,
কিছু নেই এতে— শুকনো ছিব্‌ড়ে, রস পাই নাই কভু।
টানাটানি আর ধকলেতে হায় ধুক্‌ধুক্ করে প্রাণ
মানবজীবন খোঁড়া ক'রে প্রভু ঘোড়া করো ভগবান!

তৈল-সংহিতা

তৈল দানে কাজ হয়, বলে সকলেই,
ঠিক নয় এই কথা জেনো আদপেই।

গণ্ডারের শ্রীচামড়ায় 'কার্লিপপি' দিলে,
খড়্গের চোট খেয়ে ফেটে যাবে পিলে।

শিবাচর্মে যদি দাও কিছু সুরভিত,
আঁচড় পাইবে মুখে, জেনো আচম্বিত।

অতএব সারমর্ম বুঝ অনুধ্যায়ী
তিসি, রেড়ি, সরষে হোক চামড়া অনুযায়ী—

বুঝে যদি দিতে পারো তৈলের মর্দন
কর্ণে না পশিবে জেনো সিন্ধুর গর্জন।

উত্তাল সমুদ্র মাঝে সাঁতার না দিয়ে
পার হবে বন্ধু তুমি 'তুড়ি'টি বাজিয়ে।।

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

১৯২২-

একজন রাজা

কখনও তোমার ধানে মই আমি দিই নি আকাশ।
তবে কেন; হে নির্জন নীল জ্যোৎস্না, শরিকের মতো
গুপ্তবিষ দিতে চাও পাতা-আঁকা শান্ত পেয়ালায়,
তোর কুব্জ অনন্তের অন্তর্ঘাত ভয় করি কত।

বোঝাই শস্যের নৌকো, শালবন, কয়লার খনি,
মস্ত এক বাড়ি কাঁপে চৌরাস্তায় নাগের বাজারে;
লক্কড়ের কারবারে যুদ্ধে জোর মুনাফা লুটেছি,
(আয়কর! অতএব) সন্তর্পণে— জানাই তোমারে।

বেহালায় ভূ-সম্পত্তি (মুক্ত হাওয়া!) চল্লিশ একর।
ঝলসিয়ে ওঠে মাছ সুরক্ষিত পুকুরের জলে;
বউ বেশ স্বাস্থ্যবতী— আমি যেন দীপ্ত এক রাজা।
মোটা-মোটা কাঁকনের শব্দ বুকে কী ঝঙ্কার তোলে।

সুখাদ্যে আমার রুচি— এক থোকা মাংসল আঙুর।
মাত্রা রেখে নারীবৃন্দ, হুইস্কিও করতে হয় পান;
লোকে বলে অপূর্ব ময়ূর নাকি ভাসে সন্ধ্যাকাশে।
বিপুল কুস্তিগীর যার কোনো রাখে না সন্ধান।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১৯২৪-

রাজপথে কিছুক্ষণ

দেখুন মশায়,
অনেকক্ষণ ধরে, আপনি ঘুরঘুর করছেন,
কিন্তু আর নয়, এখন আপনার সরে পড়াই ভালো।
এই আমি হলফ করে বলছি,
কলকাতা থেকে কৈম্বাটুর অব্দি একটা
প্যাসেন্‌জার বাস্‌-সারভিস্‌ খুলবার সত্যিই খুব দরকার আছে কিনা
তা আমি জানি নে।
আপনার যদি মনে হয়, আছে,
তা হলে, বেশ তো, যান,
যেখানে যেখানে সিন্নি দেবার, দিয়ে,
জায়গামতন ইন্‌ফ্লুয়েন্স্‌ খাটিয়ে
লাইসেন্‌স্‌ পারমিট্‌ ইত্যাদি সব জোগাড় করুন,
যাঁকে যাঁকে ধরতে হয়, ধরুন,
আমাকে আর জ্বালাবেন না। আমি
নেহাতই একজন ছাপোষা লোক,
টাইমের ভাত খেয়ে আপিস যাই,
অবসর-টবসর পেলে ছোটো মেয়েটাকে নামতা শেখাই,
কৈম্বাটুর যে কোথায়,
মাদ্রাজে না পাঞ্জাবে, তাই আমি জানি নে।
আপাতত তাড়াতাড়ি
শ্যামবাজারে যাওয়া দরকার, ভাগ্যবলে যদি একটা
শাট্‌ল্‌-বাস্‌ পাই
তা হলেই আমি আজকের মতন ধন্য হতে পারি।

দেখুন মশায়,
সেই থেকে আপনি আমার সঙ্গে সেঁটে আছেন।
কিন্তু আর নয়, এখন আপনার সরে পড়াই ভালো। আপনি
বিশ্বাস করুন চাই না- করুন,
দুই হাতের পাতা উল্‌টে দিয়ে এই আমি
শেষবারের মতন জানালুম, কেন
কৃষ্ণমাচারী গেলেন
এবং শচীন চৌধুরী এলেন,
তার বিন্দুবিসর্গও আমি জানি নে।
আমি একজন ধিনিকেষ্ট,
কলম পিষতে বড়োবাজারে যাই।
পিষি,
সাবান কিংবা তরল আলতার শিশি
কিনে বাড়ি ফিরি, গিন্নী
কলঘরে ঢুকলে বাচ্চা সামলাই।
আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা না-করা সমান,
ভোটারদের আল্‌জিভ না দেখিয়ে যাঁরা বক্তৃতা দিতে পারেন না,
আপনি বরং তাঁদের কাছে যান।
আমার এখন তাড়াতাড়ি
শ্যামবাজারে যেতে হবে। সঙ্গে যদি আসতে চান, আসুন।
লজ্জা-টজ্জা না করে একটু শব্দ করে কাসুন,
তা হলেই আপনার বাস্‌ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে পারি।

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

১৯২৪-১৯৬৬

এপিটাফ

আমাদের এই বসুন্ধরা
মনসাকাঁটা-গুল্‌মে ভরা,
আমরা যখন থাকব না আর
পাওনা-দেনা রাখব না আর,
ভঙ্গ চেয়ার দেয়াল জোড়া ঝুল মে ভরা।
তখন যারা আসবে তারা
করবে বাতিল মোদের আপীল,
বলবে 'অচল' শূল মে চড়া।
ভাবতে ভালো লাগছে ভীষণ
আসবে নতুন শ্রীরামকিষণ,
নতুন যুগের নতুন বিবেক
পুরাতনকে ভুলিয়ে দিবেক,
বলবে ফ্রয়েড এবং মার্কস্‌ ভুল মে ভরা।...
তাদের প্রাইজ-বণ্ডে জানি
থাকবে না তো একটুখানি
মোদের যুগের রক্তচিহ্ন,
আমরা তখন ছিন্নভিন্ন
বৈতরণীর কূল মে খাড়া।
তবু কোথাও হীরক-পান্না—
মোদের হাসি মোদের কান্না
কঠিন দুখে গভীর সুখে
একবিংশর পাষাণ বুকে, কী কৌতুকে
বলছে যারা এলাম-গেলাম
আমরা তারা দিই নি সেলাম
শুধুই beautyfool-কে ছাড়া।

অমিতাভ চৌধুরী

১৯২৮-

ছড়া

১

ঢ্যাম কুড়কুড় ধা-কুড়িয়া
বাস চলেছে ঢাকুরিয়া।
বাসের ভিতর বসে আছেন
ডালহাউসির চাকুরিয়া।

২

হাট্টিমা টিম টিম
পাড়ে লোডশেডিম্।
ব্যাণ্ডেল আর সাঁওতালডি
পাড়ে ঘোড়ার ডিম।
হাট্টিমা টিম টিম।

হাট্টিমা টিম টিম।
পিদিমও টিম্‌টিম্।
মশারা সব সেতার বাজায়
দারা দারা দ্রিম।
হাট্টিমা টিম টিম।

৩

ছোটোলোক বা বড়োলোক
সবাই যাবে পরলোক।
ছোটোই থাকো সুতরাং,
যেমন থাকে পিঁপিড়াং।।

অরবিন্দ গুহ

১৯২৮-

পৌত্তলিক

ভালোবেসেছিলাম একটি স্বৈরিণীকে
খরচ ক'রে চোদ্দ সিকে।
স্বৈরিণীও ভালোবাসা দিতে পারে
হিসেবমতো উষ্ণ নিপুণ অন্ধকারে।
তাকে এখন মনে করি।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি-হরি।

কী নাম ছিল? সঠিক এখন মনে তো নেই;
আয়ুর শেষে স্মৃতি খানিক খর্ব হবেই।
গোলাপী? না, তরঙ্গিণী? কুসুমবালা?
যাক গে, খোঁপায় বাঁধা ছিল বকুলমালা,
ছিল বুঝি দু চোখে তার কাজল টানা,
চোদ্দ সিকের ছুঁয়েছিলাম পরীর ডানা;
এখন আমি ডানার গন্ধে কৌটো ভরি।
কৃষ্ণ-কষ্ণ হরি-হরি।

অন্ধ কিছু দেখে না, তার কণ্ঠ পারে
ফুল ফোটাতে অন্ধকারে।
অন্ধকারে যে-গান বানাই একলা হাতে
সুদূর সরল একতারাতে,
সে-গান কোথায় ভাষা পেল, স্বচ্ছ ভাষা?
মূলে আমার চোদ্দ সিকের ভালোবাসা।
জলের তলায় মস্ত একটা আকাশ ধরি।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি-হরি।।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩০-১৯৯৬

১

ছিঁচকে ছুঁচো ছ্যাঁচড়া যত হুচুক্‌চুকে চড়ে
চরকি বেগে ভীষণ রেগে শহরটাকে ঘোরে।
হাজারখানেক টিকিট হাতে কানে ধরায় তালা,
টিকিট কিনুন— মধ্যরাতে 'রাম-রাবণে'র পালা!
যেখানে যায় চতুর্দিকেই কী যে তাড়া লাগায়,
ছেলেবুড়ো সবাইকে তাই নিদ্রা থেকে জাগায়।
রাব-রাবণের যুদ্ধ দেখে বুদ্ধ নেমে এলেন,
স্টেজের ওপর মোজাসুদ্ধ দশজোড়া বুট পেলেন।
পছন্দসই এক জোড়া বুট নিলেন তিনি বেছে,
বাকিগুলো সস্তা দরে হয়তো দেবেন বেচে।
শেষের দিকে রাবণ এসে রামের কাছে গিয়ে
সিগারেটের প্যাকেট নিলেন সীতা ফেরত দিয়ে।

২

হিটলার মুসোলিনি তেনজিং নোরকে
নামগুলো শুনে কেউ যেতে পারে ভড়কে।
ড্যানিয়েল ডিফো আর স্যামুয়েল জনসন
নাম দুটো ভাবলেই মাথা ঘোরে বন্‌বন্‌।

সুনীল বসু

১৯৩০-১৯৯৫

দুজন

মুখোশ-পরা লোকটা এল মুখোশ-পরা লোকটার কাছে
দুজনে হাত ঝাঁকানি দিয়ে খুব কষে করমর্দন করল
একজন মুখোশ-পরা লোক
হাসল হা হা হা হা হা হা করে
আর-একজন মুখোশ-পরা লোক
হাসল হো হো হো হো হো হো করে
আর
দুজনেই ওরা দুজনকে বলল
'সাবাস সাবাস'
'সাধু সাধু'
তারপর দুজনেই ওরা চলে গেল দু দিকে
অনেক দূরে
সেখানে ওরা দুজনেই দুজনের মুখোশ খুলল
আর দাঁত কড়মড় করে
দাঁত কিড়মিড় করে বলল

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৩০-

চারজন ও বিম্‌লি

চারজন : রাস্তার মোড়েই এসে থামতে হয় রোজ
বিম্‌লি তোর পানের দোকান,
দু-খিলি সাজ তো মিঠে পান
চুন কম স্পর্শ বেশি দিয়ে;
সন্ধ্যায় বিস্তৃত ভোজ ছিল শালজঙ্গল পেরিয়ে।

বিম্‌লি : আমাকে ডাকলে না কই গান-বাজনা এলাহি ব্যাপার
যেখানে হচ্ছিল, —আমি লণ্ঠনের শিখাটির দিকে
চেয়ে-চেয়ে নিজেকেই দেখছিলাম; একটু দূরে ঘন অন্ধকার
জঙ্গল নিঃশব্দে ভয় দেখাচ্ছিল একা এক নক্তচারিণীকে।
বহু দূরে তোমাদের উন্মাদ মাদল বাজছে, কাচের বাসন
আহ্লাদে আটাশ টুকরো হয়ে ভাঙছে শুনছিলাম; মনে
হচ্ছিল— লণ্ঠন যদি জ্বেলে রাখি, জেগে থাকি, তোমাদের কথোপকথন
শুনতে পাব এক সময়, বিম্‌লিকেও কোনো শুভক্ষণে
মনে পড়বে, রাস্তার মোড়েই ওর পানের দোকান
বিম্‌লি বড়ো ভালো সাজে পান,
পান-পাতার মতো সে-ও দুই টুকরো হয়ে বসে থাকে
একটি লণ্ঠন হয়ে জ্বলে, একটি নিমন্ত্রণলিপি হয়ে ডাকে।

চারজন : নির্জন অরণ্য দেখে এত ভয় তোর
চারজন আখ্‌খুটে জোচ্চোর
সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই
উচ্ছ্বসিত হয়ে যাস; কই
ভাবিস না ওরাও নিষ্ঠুর
হতে পারে এ-মুহূর্তে— ক্রূর

হাসি স্নেহ সম্ভাষণ-ছলে;
সে কি এই চারজনের পরনে পাৎলুন আছে বলে?

বিম্‌লি : শীতল কুটিরে শালজঙ্গলের কোলে পদতলে
পনেরো বছর আগে জন্ম, সেই পনেরো বছর ধরে ঘুম-···
হঠাৎ জেগেই মনে হল, কেন কৃষ্ণকলি শরীরমণ্ডলে
ডিম ভাঙার শব্দ হচ্ছে?...
শালবন আমাকে বুঝবে না— ওরা জ্ঞাতিশত্রু
আত্মীয় কুটুম।
পান হয়ে বসে আছি দীর্ঘকাল পানের দোকানে
সে-খবর বনের ওপারে যারা টেরি কাটে
জামায় এসেন্স মাখে— হাসে
মহুয়ায় মাতে, — তারা জানে,
আমার নির্জনে এসে ফিরে যাবে কেন মাঘ মাসে?

চারজন : আমাদের সর্বনাশা খিদে
পাগ্‌লি তুই দেশলাই ধরালি
জ্বালানি দে বিম্‌লি, জ্বালানি দে
দেখা তোর তরমুজের ফালি;
লণ্ঠন বুকের মধ্যে লুকো
নয়টি নয়ন তোর জ্বালা
যেন রোষ বর্ষে তোর তরুতনু নাসার বন্দুকও,
আমরা চারজন লোভে আকাঙ্ক্ষায় লেলিহান,—
খুলে দে জানালা।...

মুগ্ধা, তোর চক্ষে কেন জল
আজ রাত্রে একটু ঘুমোবি না?
আমরা থামিয়েছি কোলাহল।
তোর ছিন্নভিন্ন দেহে জ্বর
তোর ছিন্নভিন্ন মুখে ঘৃণা
চার দেয়ালে পাতকী অক্ষর।

ওঠ্ বিম্‌লি ছাড়্ লক্ষ্মী ছাড়্
শোন্ বিম্‌লি এবার বাড়ি যা
রাক্ষসের নির্মম প্রহার।
শোন্ বিম্‌লি এবার বাড়ি যা।

বন্ধু

তোমাকে বলেছিলাম
ওরা কেউ কারও বন্ধু নয়
ওই দেয়াল আর পেরেক
ওই জুতো আর জুতোর মধ্যে পা
ওই বোতল আর ছিপি—
ওরা এক সঙ্গে থাকে মানায় ব'লে।
ওরা কেউ কারও বন্ধু নয়।
একদম আলাদা ধাতুতে তৈরি
দুটো করে জিনিস
কিভাবে মুখে মুখ দিয়ে বসে থাকে। তাই ভেবে তুমি অবাক—
আমরা নিজেদের দিকে চেয়ে দেখি না।

কবিতা সিংহ

১৯৩১-১৯৯৮

নিধুবাবুকে নিবেদিত

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! আমার ফুলেল রুমাল
পীরিতির মরণ ফাঁসে
বুঝি বা ফাঁসি পরলাম!

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! আমার আঁখির কাজল
ও নয়নে পানসি নিয়ে
ভরাডুবি কম্‌নে হলাম?

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! সাধের নাকচাবিটি
নকলির ঝিলিক লেগে
চোখ ধেঁধে অন্ধ হলাম!

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! আমার বাগান-খোঁপা
বিনুনির বেলকুঁড়িতে
কোন্ সুখ উথ্‌লে দিতাম?

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! আমার পার্শিচুড়ি
পাকে পাকে বাঁধন কেমন
কী করে বা জানতে পেতাম!

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! বুকের নীল কাঁচুলি
চুমকির রক্ত ছড়ায়
উল্কিতে নাম বুকে লেখালাম!

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! কাঁচপোকার তিলক
চলতে ফিরতে টিপের ঝিলিক
ক্যামনে কাঁপে কবে জানতাম?

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! আমার সুধার বোতল
নেশাতে চুরচুর প্রাণ
আভাঙা এ দেহে লুকাতাম।

তোমারই বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! আমার পরের সোনা
কানে দিয়ে হ্যাঁচকা সে টান
সইতে গিয়ে মরে জিয়োলাম।

শঙ্খ ঘোষ

১৯৩২-

বাবুমশাই

‘সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা
বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তা ছাড়া ভাই

আর তা ছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ চোখের সামনে, বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা

যাবে খোল-নলিচা পালটে বিচার করবে নিচু জনে’
—কিন্তু সে দিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশায়

মিত্র বাবুমশায় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই—
মাঝেমধ্যে ভাবেন তাদের, নুন আনতে পান্তা-ই
নিত্য ফুরোয় যাদের

‘নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলার কুকুর
সেটা হয় না বাবা

সেটা হয় না বাবা’ বলেই থাবা বাড়ান যতেক বাবু
কার ভাগে কী কম পড়ে যায় ভাবতে থাকেন ভাবুক
অম্‌নি দু চোখ বেয়ে

অম্‌নি দু চোখ বেয়ে অলপ্পেয়ে ঝরে জলের ধারা
বলেন বাবু ‘হা বিপ্লবের সব মাটি সাহারা।’

কুমির কাঁদতে থাকে

কুমির কাঁদতে থাকে 'আয় আমাকে নামা নামা' ব'লে
কিন্তু বাপু আর যাব না চরা-তে জঙ্গলে
আমরা ঢের বুঝেছি

আমরা ঢের বুঝেছি খেঁদীপেঁচী নামের ওসব আদর
সামনে গেলেই ভরবে মুখে প্রাণ ভরে তাই সাধো,
তুমি সে-বন্ধু না

তুমি সে-বন্ধু না, যে ধূপধুনা জ্বলে হাজার চোখে
দেখতে পাবে তাকে সে কি যেমন তেমন লোকে—
তাই সব অমাত্য

তাই সব অমাত্য পাত্রমিত্র এই বিলাপে খুশি—
'শুঁড়িখানাই কেবল সত্য আর তো সবই ভূষি
ছি ছি হায় বেচারা'

ছি ছি হায় বেচারা? শুনুন যারা মস্ত পরিত্রাতা
এ-কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা
হেঁটে দেখতে শিখুন

হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়
সাহেব বাবুমশায়!

পাগল হবার আগে

ফুল-বেলপাতা ড্যাডাং ড্যাং
ঘন কাসুন্দি ড্যাডাং ড্যাং
দিন যদি তার চোখ শুষে নেয়
রাত্রিবেলার মাথায় ব্যাঙ।

ছা পোষা ছাপ্পা ধে ধে রে খাপ্পা
বুঝে গিয়েছি হে বেবাক ধাপ্পা
মাথার ভিতরে উলটে গিয়েছে
তিন-চার জোড়া গোরুর ঠ্যাং

কাটা-কাট্-কাট্ আরে আকাট
এই ডান-কাত এই বাঁ-কাত
দিনদুপুরে যে সবই ডাকাত
জবর গ্যাং!

ফুল-বেলপাতা ড্যাডাং ড্যাং
ঘন কাসুন্দি ড্যাডাং ড্যাং
ছড়িয়ে গিয়েছে আসল গ্যাং
অহো রে শহরে গ্যাঙরগ্যাঙ।

গানের মতো

আমিই যখন লাঠি মারি
তখন সেটা মিষ্টি ভারি
তখন সেটা ন্যায়ের ধ্বজা-
ধারী

আমি যখন চালাই গুলি
বুলেট তো প্রায় ক্ষীরের পুলি
লক্ষ্যে ঠিকই থাকে মাথার
খুলি

চোখ যা দেখে বেবাক ফাঁকি
বুব্‌লা বুবু সিন্‌সিনাকি
উলটো বললে হবেই তো গোস্
তাকি

আমি যখন মারছি তোমায়
বুঝতে হবে সে সব সময়
মরছ কেবল নিজের নিজের
বোমায়
গোটা মগজ আমায় দিয়ো
তবেই হবে দেশপ্রিয়
দেশও হবে অবিস্মর-
ণীয়
এই কথাটা ইতস্তত
ছড়িয়ে দিলে গানের মতো
মনের মধ্যে থাকবে না আর
ক্ষত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১৯৩৩-

অ্যাকুয়েরিয়ামে

তুমি বুঝি ভেবেছিলে অ্যাকুয়েরিয়ামে মৃত্যু নেই?
ঈর্ষ্যা ঘৃণা মাৎসর্য এ সব কিছুই সেইখানে
বিন্দুমাত্র নেই, শুধু সহজাত ভদ্রতা রয়েছে?
তুমি বুঝি ভেবেছিলে সুনির্বাচিত মীনরাশি
হীনম্মন্য হতে খুব অসমর্থ? গৃধ্নুতা অথবা
পরকাতরতা বলে শব্দ নেই তাদের সংসদ-
অভিধানে? দুধের শিশুর মতো ওদের কামড়?
তবে সত্য কথা বলি (এক-এক সময়ে সত্য কথা
অত্যন্ত অপরিহার্য), অ্যাকুয়েরিয়ামে মাছগুলি
ভয়ানক নীচ আর স্বার্থপর, ছিন্নমূল কিছু
ধনাঢ্য উদ্‌বাস্তু যথা কলকাতার প্রান্তিক পল্লীতে
মসৃণ বসতি করে, সেইমতো শহুরে গ্রামীণ
মাছগুলি কাঁচঘরে এ ওকে চুম্বন দিতে গিয়ে
বিষাক্ত দংশন করে, যখন জৃম্ভন তোলে, ভাবি,
—আমরা মানুষ যত— সুন্দরের কাছাকাছি এসে
স্নিগ্ধ ধিক্কার করছে পৃথিবীকে, কিন্তু ততক্ষণে
মৎস্যকুল মাৎস্যন্যায়ে গুছিয়ে নিয়েছে নিজ-নিজ
মোটা মাইনে, স্ত্রীর জন্য নগ্ন শাড়ি, শালীর জন্য
দ্ব্যর্থক বুকের জামা। এখানে এ কথা বলা ভালো,
স্ত্রীরা খুব সন্নিকটে থাকা সত্ত্বেও মৎস্যকুল
প্রধানত সহগামী, শ্যাওলা সরাতে গিয়ে, তাই
শ্যাওলায় জড়িয়ে পড়ে মাছগুলি; ভার্যার সমীপে
ভাষ্য দিতে গিয়ে বলে 'মরার সময়টুকু নেই,
এটাই ট্র্যাজেডি দেখ, তা ছাড়া দু বেলা শ্যাওলা-সাফ

শরীরে পোষায় নাকি ? কিন্তু কর্ম সে-ই তো জীবন
পুরুষের' এর উত্তরে মহিলা-মাছেরা নথ নেড়ে
যদিও-বা কিছু বলে, বুদ্‌বুদের কোলাহলে সবই
চাপা পড়ে যায়... সব তিরস্কার খিলিখিলি হয়ে
অনুমোদনের মতো বেজে ওঠে। তখন সোৎসাহে
পুরুষেরা চলে যায় পুরুষের দিকে; এইভাবে
পুরুষানুক্রমে কিছু ব্যভিচার অগভীর জলে
রয়ে যায়; মৃত্যু জমে, জমে ওঠে, মৃত্যু সত্ত্বেও
করোটি সুদৃশ্য আছে মাছঘরে, মাছের কঙ্কাল
চৈত্রের পাতার মতো উপশিরাবহুল গহনে
শুয়ে থাকে, এবং তখনই মাছ মৃত্যুর মাধ্যমে
শুদ্ধ হয়ে ওঠে আর বৎসর-বৎসর চলে গেলে—
স্তরপরম্পরা ঠেলে মানুষের রাজ্যে উঠে এসে
পুরুষের ডান হাত হয়ে যায়, পুরুষের হাতে
বিশেষত্ পুরুষের বোধিবিদ্ধ হাতের পাতায়
সভ্যতার সব পাপ স্তব্ধ মানচিত্র হয়ে আছে।।

বিতরণ

দেখ, দেখ, 'হরিনাভি ডেয়ারি'র থেকে
কে এনেছে সয়াবীন আর ধুতুরার
অঙ্কুর মিশিয়ে দুধ, বীজগণিতের মাপে

শিশুরা দাঁড়িয়ে আছে— কেরোসিনে ভেজা ধারাপাত—
তাদের দুধের দাঁত ঝরে গেল সেই দুধ খেয়ে,
তাই তারা প্রাজ্ঞ বলে পদবী পেয়েছে অন্ধকারে...

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৩-১৯৯৫

মজা হোক — ভারি মজা হোক

তোমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবো, ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
এখন একটু চুপটি ক'রে বসে থাকো
আমি একটি হাত টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি, সেই হাতে
ভুবন ধরার্ মতো তোমার পদতল ধ'রে রাখো
আমিও চুপটি কার বসে থাকব
তুমি আমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবে
ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
আমরা দুজন ওদের আদর-আহ্লাদের ফাঁকে ফাঁকে
নাচ-নাচুনি কোঁদল দেখব।

আমি বিষয়টা খুব নম্রভাবেই শুরু করতে চাই
চুলের টায়রা থেকে শুরু করার উচ্চাভিলাষ আমার নেই
বুলবুলিটা কথার কথা — বলতে হয় বলেই বললুম,
ঘুষ-ঘাষের কথা নয় তো।
তবু একটা চেড়ার আড়াল, একটা ফর্ম থাকা ভালো।

তোমার বুক দেখলে আমার মেদিনীপুরের কথা মনে পড়ে
দেশ-গ্রাম নয় — সুদ্দু ঐ, 'মেদিনী' শব্দটা
নাম বদলে মাঝে মাঝে 'মেদিনীদুপুর' করতেও ইচ্ছে হয় —
দুপুর, মাঝে দুখানা, দুখানা মানে দু বুক

এত খুলে না বললেও চলত, চেড়ার আড়াল তো
মোটামুটি পছন্দই করো
তবু, আচারের তিজেল খুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে সাধ্য করে? একা?

বিষয়ের মুখোমুখি ?
সমালোচকের কানে গোঁজা পেন্সিল তখ্‌খুনি গদ্য পদ্য কাটা-ছেঁড়া
করতে নেমে আসবে না ?
বহুকাল বাদে তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে পেয়ে আমাকেও পেয়েছি
ভারি মজা করার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু
এসো, দুজনেই আঁধার-করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি
মজা হোক — ভারি মজা হোক একখানা
বিনি টিকিটে বহু লোককে হাসানো যাক
ঐ সব মন-খারাপ মজা দিঘি ব্যাঙ-বাবাজি লোক ঠকিয়ে
ভীষণ মজা হোক।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩৪-

মহারাজ, আমি তোমার

মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরোনো বালক ভৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না? তোমার বুকে হোঁচট পথে
চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি, বেতের মতো গান সয়েছি
দু হাত নীচে, পা শূন্যে — আমার সেই উদোম নৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না? মহারাজ, মনে পড়ে না? মহারাজ,
চাঁদের আলোয়?

মহারাজ, আমি তোমার চোখের জলে মাছ ধরেছি
মাছ না মাছি কাঁকরগাছি একলা শুয়েও বেঁচে তো আছি
ইষ্টিকুটুম টাকডুমাডুম, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ!
অমন তোমার ভালোবাসা, আমার বুকে পাখির বাসা
মহারাজ, তোমার গালে আমি গোলাপ গাছ পুঁতেছি—
প্রাণঠনাঠন ঝাড়লণ্ঠন, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ!

মহারাজ, মা-বাপ তুমি, যত ইচ্ছে বকো মারো
মুঠো ভরা হাওয়ার হাওয়া, তা কেবল তুমিই পারো।
আমি তোমায় চিমটি কাটি, মুখে দিই দুধের বাটি
চোখ থেকে চোখ পড়ে যায়, কোমরে সুড়সুড়ি পায়
তুমি খাও এঁটো থুতু, আমি তোমার রক্ত চাটি
বিলিবিলি খাণ্ডাগুলু, বুম্ চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা ধিন্ না উসুখুসু সাকিনা খিনা
মহারাজ, মনে পড়ে না?

তুষার রায়

১৯৩৪-১৯৭৭

ব্যাণ্ডমাস্টার

আমি অঙ্ক কষতে পারি ম্যাজিক
লুকিয়ে চক ও ডাস্টার
কেননা ভারি ধুন্ধুমার ট্রাম্পেটবাদক ব্যাণ্ডমাস্টার,
তখন প্রোগ্রাম হয় নি শুরু— সারা টেম্পল্ নাম্নী ক্যাবারিনা
তখন এম্নি বসে ডায়াসের কোণে,

আমি ড্রামে কাঠি দেওয়ামাত্র ওর শরীর ওঠে দুলে,
ড্রিরি— ড্রাঁও স্ট্রোকেতে দেখি বন্যা জাগে চুলে,
তিন নম্বর স্ট্রোকের সঙ্গে নিতম্বেতে ঢেউ
চার নম্বর স্ট্রোকেতে ঝঞ্ঝা ওঠে গাউনের ফ্রীলে,
নম্বর পাঁচে শরীর আলগা, বুকের বাঁধন ঢিলে,

আমি তখন ড্রাম বাজিয়ে নাচাই ওকে
মারি এবং বাঁচাই ওকে,
ড্রামের কাঠির স্ট্রোকে স্ট্রোকে
যেন গালাই, এবং ঢালাই করি
শক্ত ধাতু নরম করার কাস্টার,
কেননা ভারি ধুন্ধুমার ট্রাম্পেট বাদক ব্যাণ্ডমাস্টার।
আবার বাজাই যখন স্যাক্সো চেলো
ক্যাবারিনার এলোমেলো
ডিভাইস্-এ দ্বন্দ্ব এল
আমার বাঁশির সুরের সুতোয়
দেহের ফুলে মালা
ট্রা রালা লি রালা লা
ঠিক চাবি হাতে দেখি খুলে যায় তালা।

দেবতোষ বসু

১৯৩৬-

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়া, কবে পাব ও হৃদয়খানি ?
যদিচ প্রেমিক, ইতরবিশেষ মানি।
মাঝে মাঝে তাই আনমনে পথ ভোলা,
কুসুমায়ুধের উষ্ণতা দেয় দোলা।
চোখে চোখ রেখে পুনশ্চ তাই টানি।

ও প্রিয় আনন দেখেই ভরেছে চিত্ত।
অভাবেও দেখ ভুলি নি স্বভাবকৃত্য।
কিন্নরীকুলে করি তাই আনাগোনা,
পাই প্রসিদ্ধ স্নায়বিক যন্ত্রণা।
প্রেমের ত্রিভুজে মেলাই অলস বৃত্ত।

লোকনিন্দায় নিক্ষেপি দম্ভোলী,
প্রত্যহ দোঁহে ওড়াই গানের কলি।
এ তো তুমি জানো, জানে অন্তর্যামী
মৃগসুকুমার স্বভাবপ্রেমিক আমি।
তোমার বিরহ-অনলেই আমি জ্বলি।

অঘোরপন্থী নই, গৃহসুখই ভূমা।
সদাশিব ছাড়া নাগালে কে পায় উমা ?
সতত ভদ্র, সিগারেটে শুধু নেশা:
পরঘরণীর সাথে নেই মেলামেশা।
তরুণকান্তি, নই তো বজ্রপাণি—
মহাশয়া, কবে পাব ও হৃদয়খানি ?

তারাপদ রায়

১৯৩৬-

নিসর্গ

শ্রীমতী নিসর্গসুন্দরী দেবীর সঙ্গে শেষবার দেখা হল
রাণাঘাট শহর পেরিয়ে চূর্ণী-নদীর উত্তর পারে।

তখন বিকেল বেলা
একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে, পশ্চিমে কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে
সার্চলাইটের মতো দেখা যাচ্ছে লম্বালম্বি রোদের রেখা।
একটা রামধনু পূর্ণবৃত্ত হবে কি অর্ধবৃত্ত হবে
এ বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় মনস্থির করার জন্যে
তিন মিনিট সময় নিল,
একটু পরে ম্যাজিক
দমকা হাওয়ায় মেঘের তাঁবু ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ল
কিন্তু তার নীচে বিশ্রামরত রামধনুর রা পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

তখন ধানক্ষেতের মধ্য থেকে জোর বৃষ্টি,
সারা শরীর ভেজা, মাথার চুল দিয়ে জল পড়ছে।
আলের ওপর দিয়ে সোজাসুজি হেঁটে
ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে এলেন স্বয়ং নিসর্গসুন্দরী দেবী।

অনেক দিন পরে দেখা, তবু চিনতে পারলাম,
হাত তুলে নমস্কার করলাম।
শ্রীমতী নিসর্গসুন্দরী মৃদু হেসে বললেন,
'এ বছর আর রামধনু হবে না, আবার সামনের বছর।'
বলে হাসতে হাসতে বৃষ্টিতে মিলিয়ে গেলেন।

কী রকম ব্যবহার

একজন কবির কাছে আরেকজন কবি
কী রকম ব্যবহার আশা করে ?
কী রকম ব্যবহার ?
সকলেরই ইতিহাসবোধ নেই, ঘরে ঘরে আলেকজান্দার
খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।
কিন্তু ঘরে ঘরে শুধু কবি,
একজন কবির সঙ্গে আরেকজন কবির
কম বেশি দু-এক ফুটের ব্যবধান,
একটা বাড়ির মধ্যে,
একটা গাড়ির মধ্যে,
একটা টেবিল ঘিরে,
একটা মাইক জুড়ে
দলে দলে কবি,
যে রকম পঙ্গপাল, দেয়ালির অন্ধ শ্যামাপোকা।
তবুও কবির কাছে কবি,
একজন নিরীহ কবির কাছে
একজন মারকুটে কবি,
একজন বক্‌বক্ কবির কাছে
একজন চুপচাপ কবি,
একজন মাতাল কবির কাছে
একজন গঙ্গাজল কবি
কী রকম ব্যবহার আশা করে,
কী রকম ব্যবহার, আলেকজান্দার ?

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩৬-

লিমেরিক-চূর্ণিকা

১

মহাশয় লোক, বাড়ি ছিল ফালাকাটা,
ব্যাব্সা-সূত্রে গেল তাঁর গলা কাটা।
মাথাটুকখানি বুকে জুড়ে দিতে টাই বাঁধবার ভারি অসুবিধে,
স্যুটের বদলে পরা তাই ছালাকাটা।

২

এক হবু মাস্তান কুংফু-র প্যাঁচ শিখে
গুরুরই নিয়েছে তুলে পকেটের পাঁচ সিকে—
'শাবাশ!' নিজেই ঘোষে, সিদো-কানু ডহরে সে
গড়েছে নিজেরই এক মূর্তি সে প্লাস্টিকে।

৩

সুশীলিত যুবা, ছিকলিয়া ধূমপায়ী,
মিনিবাসে তাঁর জানলার সিট্ চাইই!
ফিল্ম-ক্রিকেটের পোকা, বাঁ-নীতিতে একরোখা,
নারীমুক্তির উদগ্র উৎসাহী।।

৪

এক বাবু তার গানের গদি বটতলাবাজারে,
রাংতাপাতার দোনায় মুড়ে গিটকিরি গান ছাড়ে।
মিঠাঈ গীতি, মেএাও গানা, রঙবাহারি দু-পাঁচখানা—
সব একদরী তঙ্কা ভরি— বটতলাবাজারে।

৫

টালার ধারে টালির ঘরে টুলু ঘোষের বাস।
টুকটুকি তার পিসির ননদ, বি.এ. (অনার্স) পাশ।
রাঁধতে পারে চাইনিজ্, হাবভাবে নেই shyness,
পিসির বাসায় গেলেই টুলুর ফেল হবে লাস্ট বাস্!

৬

হলধর গড়গড়ি, হাল বাস গড়বেতা,
মুড়ি ইউনিয়নের এক নম্বর নেতা।
মুড়ি মিলে-মিলে ছোটাছুটি তাঁর,
রাজ্য লেভেলে দাবি দুটি তাঁর :
মাইকে শোনান মুড়িশিল্পীর মিছিলে তা।

শামুকখোলা

থাকব কি মোর
খোলার ভেতর?
থাকব নাকি?
নেই বা থাকি!
থাকব তো হে
খোলায় রয়ে?
বলই না গো,
যাও গে, থাকো—
ঘুমড়ো মুখে
খোলায় ঢুকে,
কাঠখোলাতে
হাটখোলাতে

পোস্তা পাড়ে
পান্তো রাতে—
খোল খোলা খোল খোল খোলা খোল
খোল বাজে আর বোল তোলে ঢোল!
ঢাকনা মুড়ে
বাজনা পুড়ে
তাল ঠুকি জোর
খোলার ভেতর।

আকর ও পরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 'বোধেন্দুবিকাস নাটক' (১৮৬৩) দ্বিতীয় অঙ্ক। 'পৌষড়ার গীত' পাঠ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কবিতা সংগ্রহ' আশ্বিন ১২১২ (১৮৮৫) বই থেকে গৃহীত। বসুমতী প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'র (?) পাঠ।

প্যারীচাঁদ মিত্র। টেকচাঁদ ঠাকুর নামে লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ১১শ পরিচ্ছেদ।

রূপচাঁদ দাস। পক্ষীর দল নামে সখের গীতানুষ্ঠান দল স্থাপয়িতা, তাঁকে 'তদানীন্তন সুধী কাব্য ও গীতানুরাগীগণ ''পক্ষীরাজ'' উপাধি প্রদান করেন, তদবধি রূপচাঁদ পক্ষি নামে খ্যাত হয়েন' : 'সঙ্গীত রস কল্লোল' (?)।

রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'কুলীন কুলসৰ্ব্বস্ব নাটক' (১৮৫৪) তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম অঙ্ক।

মধুসূদন দত্ত। 'পদ্মাবতী নাটক' (১৮৬০), চতুর্থাঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'রঙ্গলাল' (আশ্বিন ১৩৩৬/১৯২৯) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত। 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' : বঙ্গদর্শন, পৌষ-চৈত্র ১২৮২ (১৯৭৬), বসুমতী প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'তে (?) সংকলিত।

দীনবন্ধু মিত্র। 'জামাই বারিক' (১৮৭২) তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মনোমোহন বসু। 'মনোমোহন গীতাবলী' (১৮৮৭)।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়। 'বিবাহ' চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরস' (ফাল্গুন ১৩৪২/১৯৩৬) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

প্যারীমোহন কবিরত্ন। 'গীতাবলী' (১৮৭৬)।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হুতোম প্যাঁচার গান বা কলির সহর কলিকাতা' রসিক মোল্লা বিরচিত বলে প্রকাশ নবজীবন আশ্বিন ১২৯১ (১৮৮৪), গ্রন্থাকারে (১৮৮৪), সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের (১৯৫৪) পাঠ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'রাজার উপর রাজা' : 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' ২য় সংস্করণ (১৮৯১)। 'বিরহিণীর দশ দশা' প্রকাশ বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৭৯ (১৮৭৩),

যোগেশচন্দ্র বাগল সং 'বঙ্কিম রচনাবলী' (১৯৫৫) ২য় খণ্ডে সংযোজনীর পাঠ।

কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২), 'কলিকাতার বারোইয়ারি' পূজা অধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য' (ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৬) 'কাব্যমালা'য় (১৯২০) সংকলিত। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর '...হাস্যরস' সম্বন্ধীয় গ্রন্থে জানিয়েছেন 'গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বৃহৎ গুম্ফকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।'

ইঙ্গবঙ্গের বিলাত যাত্রা' শিখরিণী ছন্দে লেখা, ভারতী, আশ্বিন ১২৮৬ (১৯৭৯)।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিশাচর নামে লেখা 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫) থেকে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র (১৯৪৮) সংযুক্ত রূপে পুনর্মুদ্রিত।

জগদ্বন্ধু ভদ্র। 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' (১৮৬৮), রামগতি ন্যায়রত্ন-কৃত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত। গ্রন্থে উল্লেখ আছে : '১২৭৫ সালের ১২ই আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় 'ছুচ্ছুন্দরীবধকাব্য' নামে একটি হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। ঢাকা জেলা পানকুণ্ড গ্রাম নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উক্ত ব্যঙ্গকাব্যের রচয়িতা।'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'রানী মুদিনীর গলি' : 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 'আয়না' (১৯০২), দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য। 'আয়না'র বিজ্ঞাপন পরিচায়িকা : 'Ayana or A Mirror / A faithful mirror of the Present Society...' ইত্যাদি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার। দুর্গাদাস লাহিড়ী সং 'বাঙ্গালীর গান' এ (১৯০৫) সংকলিত পাঠ থেকে নেওয়া। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) বইয়ে গৃহীত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। গোপাল উড়ের (মতান্তরে তাঁর শিষ্য কৈলাসচন্দ্র বারুইয়ের) বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রভাত-বর্ণনা গীতের রঙ্গানুকরণে। 'অলীকবাবু', প্রথমাঙ্ক, 'এমন কর্ম আর করব না' নামে বিদ্বজ্জনসমাগমের অধিবেশনে অভিনীত, ১৮৭৭।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পাঁচু ঠাকুর - দ্বিতীয় কাণ্ড' (১৮৮৪)।

রাজকৃষ্ণ রায়। 'উৎকট বিরহ-বিকট মিলন বা আগমনী বিজয়া', দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'রাজকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ (১৮৮৪) বইয়ে অন্তর্ভুক্ত।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' অভিনয়ের (১৮৭৩) গান, ব্যোমকেশ মুস্তফী-সংগ্রহের লেখকের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'এ (১৯৩৩) উদ্ধৃত।

অমৃতলাল বসু। 'অমৃত-মদিরা' (১৯০৩)।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। 'কৌতুক-কণা' (১৯০০), 'মোহনবাঁশি-দ্বিতীয় উল্লাস'।

স্বর্ণকুমারী দেবী। 'কবিতা ও গান' (১৮৯৫)।

দেবেন্দ্রনাথ সেন। 'গোলাপ' : 'গাজীপুর' থেকে, ভারতী ও বালক ১২৯৮। 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০)।

গোবিন্দচন্দ্র দাস। 'মশা' : 'কুসুম' (১৮৯১)। 'চুল শুকানো' : 'ফুলরেণু' (১৮৯৬)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 'সোনার তরী' (১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-পরেকার প্রথম নতুন সংস্করণের (আশ্বিন ১৩৪৮) 'গ্রন্থপরিচয়' স্থলে লিখিত হয় : '"হিং টিং ছট" কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত, তৎকালে অনেকে এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এইরূপ অনুমানের কারণ, সামাজিক মত লইয়া চন্দ্রনাথ বসুর সহিত ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একাধিকবার তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রে এই অনুমানের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন— "কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল"।'

'ক্ষণিকা' (১৯০০)। 'প্রহাসিনী' (পৌষ ১৩৪৫ / ১৯৩৯)। 'ছড়া' প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭ সংখ্যায় 'পরিস্থিতি' নামে প্রকাশিত, মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'ছড়া' গ্রন্থে এটি ৩ সংখ্যক কবিতা।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ।অনুগত বাউল শ্রী ফকিরচাঁদ বাবাজী নামে রচনা নিমতলা গঙ্গাতীর ১২ই মাঘ ১২৮৫, প্রকাশ সোমপ্রকাশ ২২ মাঘ ১২৮৫ (১৮৭৯)। বিনয় ঘোষ সং 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' চতুর্থ খণ্ডে (১৯৬৬) সংকলিত।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার। বঙ্গবাণী পত্রিকায় যথাক্রমে শ্রাবণ ১৩৩০ ও কার্তিক ১৩৩০ (১৯২৩) এ প্রকাশিত।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দী শর্মা নামে 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (১৯১৫) গ্রন্থ থেকে। 'গল্প লেখার আদর্শ' : শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৪০।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। 'রূপের ডালি' (১৯১৩) প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 'হাসির গান' (১৯০০)। 'আষাঢ়ে' (১৮৯৮)।
'মন্দ্র (১৯০২)।

রজনীকান্ত সেন। 'কিছু হল না' : 'বাণী' (১৯০২)। 'মৌতাত' : 'কল্যাণী' (১৯০৫)।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সন্দেশ, কার্তিক ১৩৩০।

প্রমথ চৌধুরী। পুলিনবিহারী সেন সং 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৬১)।

রসময় লাহা । 'অনুতাপ' : 'আরাম' (১৯১৩)। 'নারী-স্তোত্র' : 'ছাইভস্ম' (১৯০১)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পালকীর গান' : 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯১৫)। 'সাজ' : 'যাত্রাগানে রামায়ণ' বা 'রামচন্দ্রি গীতাভিনয়', মৃত্যুর পরে প্রকাশিত (১৯৬৯)। 'হুক্কার কিচ্ছা' : 'পুতলীর পালা', শারদীয় দৈনিক বসুমতী ১৩৬৫ (১৯৫৮)। 'চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প' (১৯৭১)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৪ (১৮৯৭)।

রাজশেখর বসু। 'হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্র' : বৈশাখী, বার্ষিক ১৩৫৩ (১৯৪৬)। 'ঘাস' : 'পরশুরামের কবিতা' (১৯৬০)।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। 'কলকাতার ভুল' নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' (১৯৫৮) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

গুরুসদয় দত্ত । 'পাগলামির পুঁথি'র (১৯২৯) দুটি 'লিমেরিকা'। 'চাঁদের বুড়ী' (১৯৩৩) থেকে, 'ভজার বাঁশি'র (১৯২২) কবিতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । 'হসন্তিকা' (১৯১৭), ৭৫-৭৬. 'বিদায় আরতি' (১৯২৪)।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক । 'রেঙ্গুন-রঙ্গিণী' : শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৪৬ (১৯৩৯)।

সতীশচন্দ্র ঘটক। 'লালিকাগুচ্ছ' (১৯৩০) 'সোনার ঘড়ি' রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র লালিকা বা প্যারডি।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। 'জমিদার' : ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৩ (১৯১৭)।

সুকুমার রায়। 'মন্ত্র' : 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' (রচনা ১৯২৫)। 'কলিকাতা কোথা রে' : সুভাষ মুখোপাধ্যায় সং 'পাতাবাহার' ১৩৬২ (১৯৫৫)। 'আবোল তাবোল' (১৯৩৯)।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। 'নূতন খাতা' (১৯২৩)।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 'বাড়ি ভাড়া' রবীন্দ্রনাথের 'কথা' (১৯০০) কাব্যান্তর্গত 'নগরলক্ষ্মী' কবিতার ('দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে...' ইত্যাদি) প্যারডি, শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৪৮ (১৯৪২)।

মোহিতলাল মজুমদার। 'নবরুবাইয়ত্' চামার খায় আম ছদ্মনামে শনিবারের চিঠি ত্রয়োদশ ১৫ কার্তিক ১৩৩১ সংখ্যায় (১৯২৪) প্রকাশিত, নজরুল-মোহিতলাল বিরোধের একটি নথি এই কবিতা।

কালিদাস রায় । 'রসকদম্ব' (১৯২৩)।

নলিনীকান্ত সরকার। 'মোহমুদ্গর' পরিমল গোস্বামী কৃত 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' (১৯৯৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য । 'স্বর্গীয় ফলার' ভোজনবিলাসী বাঙালির জন্য উপাদেয় একটি ভোজন-চিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'ঈশ্বর গুপ্তের পর হইতেই আমাদের সাহিত্যের মধ্যে যে পাশ্চাত্য প্রভাবিত কৃত্রিম ধারা সৃষ্টি হইল, তাহাতে ভোজন-চিত্রের স্থান গৌণ হইয়া ড়িয়াছিল', এই কবিতায় তার একটা পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য সং 'যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় (১৯৬৩) সংকলিত।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। 'মডার্ন কবিতা' (১৯৪১)।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। 'প্রীতি-উপহার' দিবাকর শর্মার নামে 'দিবাকরী' (১৯৫৮) সংকলনে অন্তর্ভুক্ত।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। 'দরদ' : 'বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা' (১৯৫৮) ও 'বিবাহের ব্যাকরণ' : প্রবাসী, মাঘ ১৩২৭।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হরি হরি' : শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫১।

কাজী নজরুল ইসলাম। 'প্যাক্ট' : 'চন্দ্রবিন্দু' (সেপ্টেম্বর ১৯৩১) কাব্যের 'কমিক গান' পর্যায়ভুক্ত। 'চন্দ্রবিন্দু' ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১এর সরকারি নিষেধাজ্ঞাবলে বাজেয়াপ্ত হয়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয় ৩০ নভেম্বর ১৯৪৫এ।

জীবনানন্দ দাশ। 'সুবিনয় মুস্তফী' : 'মহাপৃথিবী'র সংযোজন, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৪)। 'লঘু মুহূর্ত' : 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)।

সজনীকান্ত দাস। শনিবারের চিঠির যথাক্রমে মাঘ ১৩৩৪ (১৯২৮), বৈশাখ ১৩৩৫ (১৯২৮) ও ভাদ্র ১৩৫০ (১৯৪৩) সংখ্যায় মুদ্রিত।

প্রমথনাথ বিশী। 'বর্ষফল ১৩৬০...' : 'কমলাকান্তের আসর' কলমে মুদ্রিত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা বৈশাখ ১৩৬০।

অমিয় চক্রবর্তী। 'নাগরদোলা' : 'খসড়া'র (১৯৩৮) কবিতা। 'পাগলা জগাইয়ের গান' : 'ঘরে ফেরার দিনে'র (১৯৬১) এবং 'বোমারুর আশ্বাস': 'অমরাবতী' (১৯৭২) কাব্যে অন্তর্গত।

সুনির্মল বসু। 'সাইকেলে বিপদ' প্রথম জীবনে লেখা কবিতা, 'সুনির্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় ১৯৫৮ সংকলিত।

মনীশ ঘটক। শান্তি লাহিড়ী সং বাংলা কবিতা যুবনাশ্ব বিশেষ সংখ্যার (১৩৭৯/১৯৭২) 'নির্বাচিত কবি' অংশ থেকে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। 'মোহনবাগান' : রংমশাল, আশ্বিন ১৩৫১।

অন্নদাশঙ্কর রায়। 'উড়কি ধানের মুড়কি'র (১৯৪২, ৩য় সং ১৯৫৩) কবিতা। লিমেরিক। ১: মৌচাক, ফাল্গুন ১৩৪৩, ২: 'ছড়া-সমগ্র' (জানুয়ারি ১৯৮৫)

প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৫৮)।

রাধারানী দেবী। 'মনের মতো' অপরাজিতা দেবীর নামে প্রকাশিত 'আঙিনার ফুল' (১৯৩৪) কাব্য থেকে।

সৈয়দ মুজতবা আলী। 'মার্জারনিধন কাব্য ... ইত্যাদি : 'পঞ্চতন্ত্র' (১৯৫২)।

শিবরাম চক্রবর্তী। 'পূর্বরাগ এবং পশ্চাত্তাপ' : 'আমার লেখা'র (১৯৫৫) অন্তর্গত 'অতিথি এবং অন্যান্য কবিতা' থেকে। 'যথাপূর্বম্' : শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫০।

অজিত দত্ত। ১২২. 'নইলে' : 'নষ্টচাঁদ' (১৯৪৫)। ১২৩. 'উচ্চকথক' : 'জানালা' (১৯৫৯)।

বুদ্ধদেব বসু। 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তরে'র কবিতা (১৯৫৫) 'কবিমশাই'।

প্রভাতকিরণ বসু। 'অসি ও মসী' (১৯৩৭)।

পরিমল রায়। 'মেয়ে-মহল' : বৈশাখী, বার্ষিক ১৩৫৩। 'দিল্লীকা ছররা'। কবিতা, পৌষ ১৩৫৩।

বিষ্ণু দে । 'মন দেওয়া-নেওয়া' : 'চোরাবালি' (১৯৩৭)। 'ছড়া' : 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭)। 'এপ্রিগ্রাম' : কবিতা, পৌষ ১৩৬২।

বিমলচন্দ্র ঘোষ। 'গোলমেলে ছড়া' : নতুন সাহিত্য, আশ্বিন ১৩৬২।

জগদীশ ভট্টাচার্য । 'উপদেশ' কলেজ বয় নামে প্রণীত 'ব্ল্যাকবোর্ড' (১৯৪৬) কাব্য থেকে।

অজিতকৃষ্ণ বসু। 'পাঁচন-তত্ত্ব' : শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৬১। 'পরার্থে' : 'পাগলা গারদের কবিতা' (১৯৫৩)।

কুমারেশ ঘোষ। 'আধুনিক ব্যঙ্গ কবিতা'' (দীপান্বিতা ১৩৭৬/১৯৬৯)

সমর সেন। 'ফ্লাড-রিলীফ' : 'সমর সেনের কবিতা' (১৯৫৪)। 'আনন্দমঠ' : 'বাবু-বৃত্তান্ত', 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪)।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কাঁটা, ফুল ও প্রজাপতির কথা' : 'কাব্য-সমাহৃতি' ১ম খণ্ড (১৯৭১)।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'দরোয়ান' : 'রাজধানীর তন্দ্রা' (১৯৪৩) 'এক পয়সায় একটি' কবিতাপুস্তিকার কবিতা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'আলাপ' : 'পদাতিক' (১৯৪০)। 'আশ্চর্য কলম' : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ১৯৯১। 'ছড়াই' : 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫)।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 'ধিক্ সুকুমার' : দৈনিক কবিতা, সুকুমার রায় সংখ্যা ১৯৭৩।

অরুণকুমার সরকার। 'সাবেক' : 'যাও উত্তরের হাওয়া' (১৯৬৫)।

সত্যজিৎ রায়। 'জবরখাকি' ল্যুয়িস ক্যারলের *Through the Looking Glass & What Alice Found There* পুস্তকের অন্তর্গত 'Jabberwocky' কবিতার অনুবাদ। সন্দেশ, শ্রাবণ ১৩৬৮, 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' (১৯৮৬) কাব্যে অন্তর্গত।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। সচিত্র ভারত, ২০ বৈশাখ ১৩৫১ (১৯৪৪) সংখ্যায় প্রকাশিত, 'ঘোড়া কর ভগবান' নামে কাব্যের নাম-কবিতা, 'তৈল-সংহিতা' : 'সেই আমি সাংবাদিক' (১৯৬৫) কাব্যের কবিতা।

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী। 'একজন রাজা' : 'আরশি নগর' (১৯৬১)।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। 'রাজপথে কিছুক্ষণ' : 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (১৯৬৯) কাব্যের পর্যায়ভুক্ত রচনা হিসাবে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় (মে ১৯৭০) সংকলিত।

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল। 'এপিটাফ' : অচল পত্র, পূজা সংখ্যা নয় ১৩৭১ (১৯৬৪)।

অমিতাভ চৌধুরী। 'ছড়া'র প্রথমটি 'ইকড়ি মিকড়ি'র (?) ২৮ সংখ্যক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি যথাক্রমে 'কাঠের তলোয়ার' (জানুয়ারি ১৯৯৩) বইয়ের ২৩ ও ৬২ সংখ্যক।

অরবিন্দ গুহ। 'পৌত্তলিক' : 'নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত' (১৯৬৪)।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় । 'ছড়া'র ১ নম্বর শক্তি চট্টোপাধ্যায় - এখলাসউদ্দিন আহমদ সং 'দুই বাংলার ছড়া' (১৯৯৩) ও ২ সংখ্যকটি বিষ্ণু দে সং 'একালের কবিতা' (জানুয়ারি ১৯৬৩) থেকে।

সুনীল বসু। 'দুজন' : 'হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা' (১৯৭৭)।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। 'চারজন ও বিমলি' : 'আহত ভূবিলাস' (১৯৬৫)। 'বন্ধু' : 'মৌরীর বাগান ও অন্যান্য' (১৯৭২)।

কবিতা সিংহ। 'নিধুবাবুকে নিবেদিত' : 'কবিতা পরমেশ্বরী' (১৯৭৬)।

শঙ্খ ঘোষ। ১৫৭-১৫৮. 'বাবুমশাই' ও 'পাগল হবার আগে' : 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়' (১৯৭৬)। ১৫৯. 'গানের মতো' : 'লাইনেই ছিলাম বাবা' (১৯৯৩)।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। 'অ্যাকুয়েরিয়ামে' : 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' (১৯৬৭)। 'বিতরণ' : 'জবাবদিহির টিলা' (১৯৮২)।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'মহারাজ, আমি তোমার' : 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' (১৯৬৬)।

তুষার রায়। 'ব্যাণ্ডমাস্টার' (১৯৬৯)।

দেবতোষ বসু। 'সবিনয় নিবেদন' : 'অলীক চতুর্ভুজ' (১৯৬১)।

তারাপদ রায়। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৬৬)।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'লিমেরিক-চূর্ণিকা' : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সং 'বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ' (১৯৮৪)। 'শামুকখোলা' : সূর্যাক্ষ, শীত ১৩৯৯ (১৯৯২)।

প্রথম ছত্রের সূচীপত্র

Laser typeset at Typographics, Calcutta and printed at India International Press, New Delhi - 110028